ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০

প্রথম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৫৯

প্রকাশক

সুনীলকুমার সিংহ

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট

কলিকাতা

মুদ্রাকর

বীরেন সিমলাই

শ্রীশক্তি প্রেস

৫, চৌরঙ্গী টেরাস

কলিকাতা

প্রচ্ছদ শিল্পী

খালেদ চৌধুরী

বাঁধাই

ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

১০০, বৈঠকখানা রোড

কলিকাতা

দাম দু-টাকা আট আনা

৺সত্য মাস্টারের উদ্দেশে

ঘরের সংযুক্ত মাটির এবড়োথেবড়ো রক। একটা বাতি জ্বলছে সেখানে টিম্ টিম্ করে। রকের উপরে কিছু লোক রয়েছে শুয়ে বসে। দু-একজন বয়স্ক মেয়েমানুষও বসে আছে, তাদের [illegible] দেখা যাচ্ছে দু-একটি।

একজন শুধু বসে আছে খাটিয়ায়। খালি গা, কালো বর্ণ, শরীরটা মস্ত বড় লোকটার। মাথাটা চাঁছা, মস্ত গোঁফ, গভীর কোঁচ নাকের পাশে। সারা গায়ে লোমের ছড়াছড়ি, ভ্রূর চুলে প্রায় চোখ ঢেকে গেছে। যেমন কথক ঠাকুর অমৃতবাণী শোনায় লোকজনকে, খাটিয়ার লোকটি তেমনি কথা বলে চলেছে। কথা বলার ভঙ্গিটা তার বড় অদ্ভুত। যেন সব কথাগুলোই সে বিদ্রূপ করে বল্‌ছে এবং সবাইকে হাসিয়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছে লোকটা। কখনো গোঁফ পাকিয়ে, কখনো ভ্রূ তুলে কিংবা কুঁচকে, হাতের চেটোতে ঘুষি মেরে কিংবা খাটিয়ার বাঁশে তাল ঠুকে, আবার ভীষণ বেগে কথা বলছে। সে হাসছে না। কিন্তু কথাগুলো যারা শুন্‌ছে তারা হেসে উঠছে। হাস্‌ছেও অবশ্য সসংকোচে। কেননা হেসে উঠলেই অমনি সে পেটটা খোঁচ করে এক এক ধমকের হাঁকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে সবাইকে।

শ্রোতারাও অবশ্য সকলেই একনিষ্ঠ নয়। কেউ কেউ ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে। কেউ কেউ হঠাৎ গুন্ গুন্ করে উঠছে এবং সেই গুনগুনানি যেমনি নিজের কানে গিয়ে লাগছে থেমে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। সে গান যদি কোনক্রমে একবার বক্তার কানে যায়, অমনি সে কথা থামিয়ে গায়কের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে।

গায়ক তা বুঝতে পেরেই গান থামায়। কিন্তু বক্তা খুব গম্ভীর অমায়িক গলায় বলে ওঠে, বাঃ বেশ তো গাইছিলি, গলা ছেড়ে ধর না গানটা।

লোক শুনলে ভাববে বক্তা নিশ্চয়ই গান রসিক। কিন্তু গায়ক

নয়া সড়ক শহরের শরিক হয়ে উঠছে। কিন্তু এ বস্তি বাড়িটা মান্ধাতার আমলের মত তেমনি পড়ে আছে। খোলা ছাওয়া চালা প্রায় মাটি স্পর্শ করেছে। মাথা হাঁটুতে ঠেকিয়ে বেরুতে হয় এখান থেকে। যেন উপর থেকে সমস্ত বস্তিটা ঝপ্ করে মাটিতে প্রায় গেড়ে বসেছে। অন্ধকারে মনে হয় কালো এবং শেওলা ধরা খোলা সাজানো একটা স্তূপ বিশেষ।

একটা লোক পুব দিকের গভীর অন্ধকার কোল থেকে এসে মোড়ে দাঁড়াল। চারদিকের চারটে পথের দিকে সে কয়েকবার দেখ্‌ল। কিন্তু কোন্ দিকে যাবে ঠিক না করতে পেরে ভূতের মত দাঁড়িয়েই রইল অন্ধকারে। থেকে থেকে দু-একটা গলার স্বর ভেসে আসছে ওই খোলার স্তূপটা থেকে। সেই স্তূপটার ধারেই এক জায়গা থেকে ছোট একটা আগুনের শিষ্ দেখা যাচ্ছে। যেন ফুঁয়ে ফুঁয়ে জ্বলে উঠ্‌ছে। কর্ড রোডমুখো ইমারতের একটা জানলা দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়েছে খোলার মাথায়।

সমস্ত পথটা অন্ধকার। আলো নেই পথটাতে, কিন্তু কতগুলি পোস্ট খাড়া করা আছে কিনারে কিনারে। যেন শুঁটকো হাড়গিলে ভূত দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে মাথা উঁচু করে।

থেকে থেকে আচমকা হাওয়ার ঝাপটায় ইল্‌শেগুঁড়ি ছাট আসছে। রাস্তাটা হয়ে উঠেছে ভিজে ভিজে। সেঁতানো সড়কটার এক একটা জায়গা বিনা আলোতেই চক্‌চক্ করছে।

লোকটা নয়া সড়কে এক পা এক পা করে এল, তারপর এগিয়ে গেল খোলার বাড়িটার দিকে। আসতে আসতে প্রায় চালাটার গা ঘেঁষে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বক্তৃতা বন্ধ করে দিয়েছে ইন্দ্রিয়সালসা ও ঈশ্বর দত্ত বটিকা বহন পথের ডাক্তার।

কিন্তু ভিড় একেবারে কমল না। ভিড় কমল না তাদের যা ঘরে ফেরার কোন তাড়া নেই। কেউ গেল আড্ডায়, জুয়ার বেশ্যালয়ে। কেউ শুধু পথে পথেই ঘুরতে লাগল। তবু যেন মনে ভাঁটা পড়েছে ভিড়ের ও গোলমালের।

বি, টি, রোড থেকে কাঁচা সড়ক একটা চলে গেছে গোটা ক বড় বড় বাঁক নিয়ে সোজা পুবে নিউ কর্ড রোড মাড়িয়ে রেল ল পেরিয়ে বহু দূর দুরান্তের গাঁয়ের দিকে। তার দু-পাশে চওড়া নর্দমা। তাতে জল নেই, আবার শুকনোও নয়। দইয়ের মত গা জমে আছে।

রাস্তাটার নাম নয়া সড়ক করা হয়েছে এই সেদিন। নয়া সড়কই বটে। বস্তির ভিড় এদিকটায় কম, কম তাই মানুষের ভিড়। এ পাশ ধরে রাবিশ ফেলে ফেলে চওড়া করা হচ্ছে রাস্তাটা গোটা কয়েক মিউনিসিপ্যালিটির রাবিশের গাড়ি কাঁধ নামিয়ে আছে ধারে ধারে।

চারটে চালা ঘর উঠেছে এপাশে ওপাশে পরস্পর থেকে অনে ফাঁক রেখে। কেবল নিউ কর্ড রোডের ও নয়া সড়কের সঙ্গমে ধারে এক লম্বা বস্তি। সেই বস্তিটার ধার ঘেঁষেই কর্ড রোডের দি মুখ ফেরানো একটা হাল আমলের দোতলা বাড়ি। নয়া সড় বস্তি থেকে এ বাড়িটার দিকে তাকালে একটা মস্ত অসামঞ্জস্যের দ হাসি পায়। কিন্তু কর্ড রোড থেকে দেখলে মনে হয় ছবির মত বাড়ি। মোড়ের এ বস্তিটা কিন্তু নয়া সড়কের থেকে দেখতে পুরনো। নয়া সড়ক যখন এক পাশে ধানের ক্ষেত ও অন্যদিকে বিস্তৃত মাঠের মাঝে একটা সরু পথ মাত্র ছিল তখন এই বস্তিটা তৈরি হয়েছিল। এখন

না এলেও সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশে কালো মেঘের ভিড়।
থকে পশ্চিমে পাড়ি জমিয়েছে সেই মেঘ। ছুটেছে দেশ হতে
ন্তরে দিক হতে দিগন্তে। রাজ্যের সমস্ত মেঘ যেন আকাশের
কোথাও জমে এইটুকুন হয়েছিল। আচমকা বর্ষার সাড়া পেয়ে
র পড়েছে, চলেছে মহাদেশান্তরে, স্নুতাশঙ্খ হাজার ফণার কাল-
টের মত চলেছে ফোঁস ফোঁস করতে করতে। থেকে থেকে তার
জিভ্ লক্‌লক্ করে ওঠার মত বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। একটানা
া নেই। কোথাও যেন তাকে আটকে রাখা হয়েছে। বুঝি
শের ওই মেঘ দৈত্যের নিশ্বাসে রয়েছে আটকানো। তাই তার
গ হঠাৎ চাবুকের ঘায়ের মত শিস দিয়ে ঝাপটা দিয়ে দিয়ে চলেছে।
ই ঝাপটার মধ্যে ইল্‌শেগুঁড়ির ছাটের মত বৃষ্টি এসে আবার মিলিয়ে
চ্ছে। হাওয়ায় আসে, হাওয়ায় যায়।

কার হয়ে এলেও ঘড়ির কাঁটায় অন্ধকার নামেনি এখনও। তাই
সিপ্যালিটির বিজলী আলোগুলো এখনো জ্বলে ওঠেনি।

জ্বলে উঠেছে দোকানে দোকানে, জ্বলে উঠেছে লম্ফ আর
ঘরে ঘরে।

বি, টি, রোডের উপর লোকের ভিড় লেগে গেছে। কল-
খানার ছুটির ভিড়। সারা বাংলার বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র এই বি, টি,
। কোন স্থান বিশেষ নয়। কলকাতা থেকে কাঁচড়াপাড়া।
সুদীর্ঘ পথ জুড়ে চলেছে ঘরমুখো মানুষের দল। ভিড় জমে উঠছে
-খানাগুলিতে, পানের দোকানে, শুঁড়িখানায়। কিন্তু আকাশ দ্রুত
ড়া দিয়েছে সবাইকে ঘরে ফেরার।

ই তাড়াতেই রাস্তার ওপরে বস্তু-সাজানো দোকানওয়ালারা গুটিয়ে
চ্ছে পাত্‌তাড়ি। ফেরিওয়ালারা ফেরার তাড়ায় ও অভ্যাস
: হেঁকে চলেছে। ছিটকে পড়েছে দাদ খুজলির দাওয়াইওয়ালারা,

আর রকের লোকেরাই শুধু জানে কেন তার হঠাৎ গানের এত তাগিদ। গায়ক তো বক্তার সেই তীব্র দৃষ্টি ও বাঁকানো গোঁফের দিকে তাকিয়ে কেবলি চোখ পিটপিট করে, মাটিতে নখ দিয়ে দাগ দেয়, গা মাথা চুলকোয় এবং আর সবাই তার দিকেই তাকিয়ে থাকে।

তখন খাটিয়ার বক্তা বলে ওঠে, গা না, গা শালা। কি সুখে গাইছিলি গা। সাধ করে বলি যে, তোরা জানোয়ার, অ্যাঁ ? একটা কথা হচ্ছে, শুন্‌ছে সবাই, তা না ব্যাটা গান ধরে দিলে। না শুনিস্‌ তো যা চলে যা ঘরে, শুয়ে থাক্‌ গে।

তারপরে যেন হাসছে এমনি দাঁত বের করে বলে, গ্যাখ গ্যাখ করছে গ্যাখ। বলতে বলতে সে কথান্তরে চলে যায়। বলি, তা হলে শোন্‌ এক গাইয়ের কথা বলি—

বলে সে এমনি গল্পে গল্পে গুলজার করতে থাকে। কিন্তু শ্রোতারা বোধ করি সে রস গ্রহণে ঠিক সমর্থ নয়, আর নয় তো বলি এ শোনার মধ্যে কোন বাঁধাবাঁধি আছে যে, শুনতেই হবে।

তার কথার মধ্যে বারবারই যেটা ফুটে উঠছে, সেটা হল জগতের সবটাই যখন মিছে, তখন মানুষের এত মাতামাতির কি আছে। নেই। এবং নেই বলেই ওর গল্পের বিষয়বস্তু নাই থাক তার মধ্যে বারবার একজন নায়কই এসে দেখা দিচ্ছে আর মুখ থাবাড়ি দিয়ে সে সবাইকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে। তুলনা হিসাবে সে নিজেকে দেখিয়ে বলছে, এই আমি ওসব সইতে পারিনে। সব বুঝে নিয়েছি দুনিয়ার। যা দিয়ে পেট চলবে, সেটি কর, বাকিটা সব বাদ দাও। ল্যাঠা বাড়িয়ে কি দরকার বাবা। সুতরাং গায়কের গল্পের ওই ধরনের একটা পরিণতি দিতে গিয়ে হয়তো কেউ বসে থেকেই ঘুমের টানে গড়িয়ে পড়ে, শিশু কেঁদে ওঠে।

সে অমনি বলে ওঠে, বাঃ, তোর বাচ্চাটা কী সোন্দর কাঁদে।

আরও কাঁদিয়ে দে ওকে। যার শিশু, সে বেচারী ভারী ভড়্কে গিয়ে তাড়াতাড়ি কান্না থামায়। যে ঝিমিয়ে পড়ে তাকে বলে, আমার খাটিয়াতে শুবি আয়।

ঘুম পালায় অমনি সেখান থেকে।

অথচ লোকগুলির মুখ দেখে মনে হয় না যে তারা এরকম একটা খিটখিটে বা অদ্ভুত মেজাজের লোকের সামনে বসে আছে। বরং যখন কোন হাসির কথা হচ্ছে তখন বেশ হেসেই উঠছে হো হো করে।

আগন্তুক একটু তাজ্জব হল ব্যাপারটা দেখে।

রকের নীচেই একটা ছোট তোলা উনুনে একজন হাওয়া দিচ্ছিল। তারই সামান্য ফুলকি আগন্তুক দেখতে পেয়েছিল দূর থেকে। উনুনটা ধরে যেতে সেটাকে তুলে নিয়ে উঠবার মুখে লোকটা হঠাৎ আগন্তুককে দেখতে পেল। জিজ্ঞাসা করল, কে হে ওখানে ?

আগন্তুক হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না।

লোকটা আবার বলল, নীচে ডাঁড়িয়ে কেন, রকে উঠে বস না। সকলের দৃষ্টি আগন্তুকের দিকে পড়ল। অচেনা মুখ দেখে সবাই তাকিয়ে রইল তার দিকে।

খাটিয়ার বক্তা মেজাজী গলায় হেঁকে উঠল, কে রে চাঁদু ?

চাঁদু উনুন নিয়ে রকে উঠে বলল, চিনিনে, দেখলুম ডাঁইড়ে রয়েছে ওখানে।

কে হে ? উঠে এস এখানে। চড়া গলায় হুকুম করল বক্তা।

আগন্তুক উঠে এল রকে। তার মুখে বিন্দুমাত্র ভয় বা সংকোচের আভাস নেই বরং তার ঠোঁটে মিটমিট করছে একটা চাপা হাসি। বয়সে জোয়ান, একমাথা বড় বড় চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। মুখের ছাঁদটি লম্বাটে, কোলবসা চোখ দুটোতে সরল আর হাসি-হাসি ভাব মাখা। গায়ে মাত্র একটা গলাবন্ধ হলুদে গেঞ্জি, কাপড়টা হাঁটু

থেকেও একটু উপরে তোলা। একটা চটের থলি লাঠির ডগায় বাঁধা।

লোমশ ভ্রূর তলায় প্রায় ঢাকা পড়া বক্তার চোখজোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আগন্তুকের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে যথাসম্ভব বক্র ঠোঁটে জিজ্ঞাসা করল, কী হচ্ছিল ওখানে।

যদি লোকটার কথাবার্তা হাবভাব কিছুক্ষণ আগেও আগন্তুক না দেখত শুনত, তাহলে ওই মুখের সামনে দাঁড়িয়ে চট করে কথা বলতে আটকাত। সে বলল, এই শুনছিলাম হুজুর আপনার গালগল্প।

হুজুর আপনার গালগল্প কথাটা শুনে বক্তা ঘাড় বাঁকিয়ে আরও তীব্র চোখে তাকে দেখে নিল। অর্থাৎ লোকটা তাকে পরিহাস করছে কিনা বুঝে নিল সেটা। বলল, তা এদিকে কী মনে করে।

আগন্তুক একটু উশখুশ করে জবাব দিল শহরে যাবার রাস্তাটা খুঁজছিলুম। যা আঁধার পথ। ভেবেছিলুম ইদিক দিয়ে রাস্তা টাস্তা হতে পারে।

এদিকে হতে পারে? বলতে বলতে বক্তার মুখ আরও বিকৃত হয়ে উঠল। বলল, আর খানিক রাত করে এলেই ভালো হত, বেশ পথটথও সব আপনা আপনিই দেখা যেত। এখনও তো সব জেগে আছে।

অর্থাৎ আগন্তুককে সে চোর ঠাউরেছে। সকলে ফিকফিক করে হেসে উঠল। আগন্তুক দেখল সেই মাটির দেওয়ালের ঘরগুলো থেকে আরও কিছু নতুন মুখ দেখা দিয়েছে। সেও মিটমিট করে হেসে সবাইকে একবার দেখে জবাব দিল, হেঁ হেঁ হুজুর। সবাই তো পেরায় ল্যাংটা এখানে, কার কি চুরি করব?

সেই আলো-আঁধারিতে ভূতের মত মানুষগুলোর কেউ কেউ হঠাৎ হেসে উঠল সেকথা শুনে। কেউ কেউ একটু অতিরিক্ত কৌতূহলে

কাছে এসে দেখল তাকে। কেউ কোমরে হাত দিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে। ছু-একজন অল্প বয়স্কা মেয়ে বউও দেখে নিল তাকে হেসে হেসে ঠেরে ঠেরে।

একজন বলে উঠল, বেড়ে চালু দেখছি।

কে আর একজন বলে উঠল, ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে, কাল থেকে ওকে আমার মাদারি খেলায় নিয়ে যাব। বেশ কাজ দেখাতে পারবে। একেবারে ফাস্ কেলাস্।

মাদারি খেলার অর্থ হচ্ছে বাজিকরী খেলা। ধুলো থেকে চিনি করা, কান মুচড়ে ডিম বের করা, আর রুমাল ঝেড়ে উড়িয়ে দেওয়া জোড়া পায়রা। তবে এর চেয়েও বড় কৃতিত্ব হল অদ্ভুত বক্তৃতায় ও ঢঙে এক হাতে ডুগডুগি ও আর হাতে আড় বাঁশী বাজিয়ে জনতার জমায়েত ও তাদের সমানে এক রহস্য উদ্‌ঘাটনের রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় চাকের মৌমাছির মত জমিয়ে রাখা।

আগন্তুক বলে উঠল তেমনি হেসে, তা দাদা, একটা কাজ কাম পেলে তো বর্তে যাই।

খাটিয়ার বক্তার লোমশ শরীরটা নড়েচড়ে উঠল একটু, তারপর প্রায় হুংকার দিয়ে বলে উঠল, হুঁ! কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

তা অনে-ক দূর?

বক্তা আর গলার স্বরটা অনুকরণ করে বিকৃতমুখে ভেংচি কেটে বলল, কত্ত—দূর? সাতসমুদ্দুরের ধার থেকে?

আগন্তুক বিনীত হেসে জবাব দিল, না, ইছামতির পাড়, ইটিণ্ডেঘাট থেকে।

বক্তার গোঁফজোড়া আরও খানিক বেঁকে গিয়ে চোখ ছুটো প্রায় ঢেকে গেল। কী জন্য এসেছ?

এই কাজ কামের ফিকির টিকিরে।

কী কাজ জানা আছে ?

ছুতোরের। জাতও ছুতোর, কাজেও তাই।

কে একজন বলে উঠল, ও জাতের সঙ্গে শালা কারো বনে না। ওদের ঘরেরই ঠিক থাকে না। কথায় বলে,

ছুতোরের তিন মাগ
ভানে কোটে খায় দায়
থাকে থাকে যায় যায়

খালি কাঠে কাঠে গুঁতোগুঁতি।

আগন্তুক বলল, হেঁ হেঁ কাঠে কাঠে বলেই থাকে থাকে যায়, কিন্তু যায় না। ঐ মজা আর কি! তবে অভয় পেলে একটা কথা বলি।

বল।

বলছিলুম, আমায় নিজের মাগ তার ছেলেপুলে নিয়ে অনেক দিন সগ্গে গেছে। পরের চেয়ে একটু নিজের ঘরের দিকে নজর রাখা ভালো। নইলে—

সকলেই হেসে উঠল তার কথায়। মেয়েরা একটু বেশী হাসল। বক্তা সবাইকে ধমকে উঠে বলল, আর কোন পেশা আছে ?

নেই। তবে ইয়ার দোস্তরা বলত চারশ বিশ, মানে ফোর টুয়েণ্টি।

এবারে হাসির শব্দটা আরও জোরে বেজে উঠল।

ফোর টুয়েণ্টি হচ্ছে ভারত সরকারের একটি আইনের ধারা, প্রতারণার দায়ে তা আরোপ করা হয়। কথাটা কোন কোন মহলে, বিশেষ করে কলকারখানা এলাকায় খুব বেশী শোনা যায়। কথায় কথায় বলে, অমুকে ফোর টুয়েণ্টি করে দিয়েছে, অর্থাৎ ধোঁকা দিয়েছে।

একজন বলে উঠল, বস, বসে পড় ভায়া, আজ বর্ষার রাতটা তোমাকে নিয়েই কাটিয়ে দিই।

খাটিয়ার বক্তার ভুঁড়ি যেন একটু কাঁপল. গোঁফ যেন একটু উঠল। বলল, ফোর টুয়েন্টি কেন বলে?

আগন্তুক বলল, হুজুর, ওই দায়ে মাস তিনেক জেল খেটেছিলুম। এক কাঠের গোলায় কাজ করতুম, সে গোলার মালিক ধরিয়ে দিয়েছিল।

আর কিছু জানা আছে?

রসিক আগন্তুক এবার একটু চুপ থেকে মিট্ মিট্ হাসতে লাগল। দেখল সকলেই প্রায় তার দিকে হাসিমুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। কেবল খাটিয়ার ওই দানবীয় মূর্তির মুখভাবও যেমন বোঝা যাচ্ছে না, তেমনি ধরা যাচ্ছে না তার মনের হদিসটা। তবু আগন্তুকের সেই প্রথম থেকেই কেন জানি মনে নিয়েছে, লোকটা শুধু রসিকই নয়, মনটা ও প্রাণটা তার দরাজ। একটু যা হুজুর কর্তা ভাব, মেজাজটা একটু বা চড়াভরা। কিন্তু মানুষটা ভালো।

সে বলল, আর যা জানা আছে সবই অকাজের। হুজুরের তা পছন্দ হবে না।

তবু শুনি?

এই একটু গান-টানের সখ আছে, গপ্প সপ্প বলতে পারি।

হুঁ। বলে বক্তা এক মুহূর্ত আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইল। জিজ্ঞেস করল, নাম?

গোবিন্দচন্দ্র শর্মা।

অন্যান্য লোকেরা গোবিন্দের দিকেই দেখছিল। সকলেরই কেমন একটু ভালো লেগে গিয়েছিল তাকে। চটকল শহরে দৈনিক কত লোকই আসে এবং যায়। দু-দণ্ড বসে কথা বলে যায়। দূরের খবর দিয়ে যায়, নিয়ে যায় এখানকার খবর। সুযোগ পেলে ঢুকে পড়ে কোন কারখানায়, থেকে যায় ঘরভাড়া নিয়ে। এরকম অনেক

লোককে তারা দেখেছে। দেখতে দেখতে সে মানুষ আবার পুরনোও হয়ে গেছে। আবার এসেছে নতুন মানুষ।
কখনও কখনও বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত আসে
তখন দলে দলে মানুষের মিছিল এখান থেকে চলে যায় অন্যান্য জেলায় প্রদেশে নানান কাজে। ঠিকে কাজে, কণ্ট্রাক্টরের কাজে, কোথাও পুল তৈরি বা রাস্তা গড়তে, দূর গ্রামাঞ্চলে কৃষিমজুর খাটতে।······আবার আসেও।
কিন্তু এরকম লোক তারা দেখতে পায় খুব কম।
একজন বলল, কাজটাজের আশা ছেড়ে দেও, কোন কলে একটা কাকপক্ষীও ঢুকতে পারছে না। গেটের মুখে রোজ গাদা ভিড় লেগে থাকে, আর দারোয়ানের খেউড় শুনে, গুঁতো খেয়ে সব ফিরে যায়।
গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল আকাশের কোন্ দূর থেকে। বারকয়েক বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠল মেঘের বুক চিরে। সোঁ সোঁ করে মস্ত হাওয়া ঝাপ্‌টা দিয়ে গেল খোলার চালায়।
সকলেই চুপচাপ। হাওয়ায় বাতির শিষটা কেঁপে কেঁপে উঠল, মাটির দেওয়ালের গায়ে সকলের ছায়াগুলো কিম্ভূতকিমাকারের মত উঠল দুলে দুলে।
খাটিয়ার বক্তা বলল, বস না কেন ঝোলাঝুলি নামিয়ে। এত ঝড় জল মাথায় করে কোথা যাবে এখন?
গোবিন্দ একবার বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে দেখে বলল, আজকের ঝড় তো কালকেও থাকতে পারে। মাথায় করে বেরুনো ছাড়া কি কোন গতি আছে হুজুর?
তুমি হুজুর বলছ কেন হে? হঠাৎ বক্তা এবার চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল।

গোবিন্দ আবার মিট্‌মিট্‌ করে হেসে বলল, দেখে শুনে হুজুর হুজুর মনে নিল, তাই বলছি।

মেজাজী গলায় বক্তা বলল, আমি হলুম বাড়িওয়ালা, এ বাড়ির মালিক। হুজুর টুজুর নই, বুঝেছ?

গোবিন্দ তবু বলল, মালিক মানেই তো হুজুর। এত লোকজন যার, কথায় বলে······

বক্তা আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। লোকটা তাকে ঠাট্টা করছে নাকি? না, সেরকম কিছু ধরা যায় না।

বলল, হ্যাঁ, এখানে আমার হুকুম ছাড়া কারো হুকুম খাটে না। আমার জমি, আমার ঘর, এখানে আইনও আমার।

বলে গোঁফটা বেশ করে পাকিয়ে তুলে বলল, আর দশজন বাড়ি-ওয়ালার মত আমি ছিঁচকে নই। আমার কাছে কোন অন্যায় পাবে না, আবার বেশী তেরিমেরিও চলবে না। ট্যাঁ ফোঁ করলে দূর করে দিই গলা ধরে। আমি কারো ধার ধারি না। বুঝবে, দু-দিন থাকলেই বুঝতে পারবে।

গোবিন্দ চকিতে একবার বাড়িওয়ালার মুখের দিকে দেখে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, থাকব না যখন তখন আর বোঝাবুঝির কি আছে।

বাড়ীওয়ালা ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর মুখ তুলে চোখ বুঁজে বলল, কালো।

কাছেই একটি আধবুড়ো লোক বসেছিল, বলল, বল।

তুই না কোথা কাজ পাবি বলছিলি?

হ্যাঁ।

কবে থেকে?

পরশু থেকে।

তখন বাড়িওয়ালা বলল গোবিন্দকে, দেখ, তোমার যখন পেছনে কোন লেণ্ডিগেণ্ডি নেই, আর তোমার হাড়ে যদি কুলোয়, তবে তুমি আমাদের রান্না করতে পার।

গোবিন্দ কালো এবং আর সকলের মুখের দিকে একবার দেখল।

এসব বস্তিতে ঠিক হোটেল নয়, তবে ঐ রকম একটা নিয়ম আছে। যারা পরিবার নিয়ে থাকে তারা সাধারণতঃ নিজেরাই রান্না করে খায়। বাদবাকিরা এক জায়গায় তাদের বন্দোবস্ত করে নেয়। তার মধ্যেও অবশ্য মেয়েপুরুষ সবরকমই আছে। কলে-খাটা মেয়েদের অনেকে রান্নার ঝুঁকিটা আর নিতে চায় না। যারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কারখানায় কাজ করে, তারাও কারো হাঁড়িতে নাম লেখায়।

গোবিন্দ একটু চিন্তা করে এর ওর মুখ দেখল, বাইরের দিকে দেখল একবার, তারপর লাঠির ডগা থেকে চটের থলেটা খুলে ফেলল।

একজন জড়ানো গলায় বলে উঠল, শালা ছুতোরের হাতে খাওয়া। দেখো, বাবা ভাতগুলো করাত দিয়ে চিরোনি।

প্রৌঢ়া সদী কেশো গলায় হি হি করে হেসে বলল, আর হাতুড়ি-বাঁটাল দে সব চেঁছে পুঁছে উনুনে দে বসে থেক না।

আর রান্না খারাপ হলে হাঁকড়াব দুই কোঁত্কা, একেবারে ইটিণ্ডে-ঘাট পাঠিয়ে দেব আবার। নগেন মোটা গলায় বেশ টেনে টেনে কথাগুলি শুনিয়ে দিল।

গোবিন্দের মুখে হাসিটি লেগেইছিল। সেই হাসিটির জন্য কোন কারণে বা কথাতেই হঠাৎ অপ্রতিভ মনে হয় না। ওই হাসিটুকু বর্মের মত তার মনের সব অন্ধিসন্ধির কপাট বন্ধ করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু কথাগুলি শুনে একটু ঘাবড়ে গেছে সে।

তবু বলল, তা এ তো তোমার আর মিশিনের কারবার নয়! আজ একটু নুনকটা কাল একটু বোদা পান্‌সে এ তো হবেই।

আর পরশুর কথাটাই বা বাদ যায় কেন? বল সেদিনে পুড়িয়ে সব ছাই খেতে দেবে। হরি বলল, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি নিয়ে।

বাদবাকি সকলেই টিপে টিপে হাসতে লাগল।

গোবিন্দ বুঝল এদের বন্ধুত্ব সে ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে তাই এত সহজে সবাই তাকে নানান্ কথা বলছে। বলল, তা নতুন নতুন দু-দিন একটু অসুবিধে তো হবেই। কোনদিন তো আর······

বলতে বলতে থেমে গেল সে। যেন হঠাৎ তার কিছু মনে পড়েছে এবং মুখে সেই লেগে থাকা হাসিটুকু নিয়েই শূন্য দৃষ্টিতে ক্ষণিক তাকিয়ে রইল লম্ফটার দিকে।

বাজিকর বলে উঠল, যদি কোন বন্ধক ঠেকায় পড়ে যাও তো, আমার কাছে চাইবে, আশমান থেকে পেড়ে দেব।

কে যেন আস্তে আস্তে বলে উঠল, বউয়ের ঠেকায় পড়লেও।

গোবিন্দ তাকিয়ে দেখল কথাটা বলছে ষণ্ডামার্কা নগেন, আর মেয়েরা হাসছে খিল্‌খিল্ করে।

বাড়িওয়ালা বলল, আর ওইসব গান-গপ্প কি সব বল্‌ছিলে, ওসব বিলকুল চলবে না। ওসব হল আনাড়ী লোকের কাজ।

গোবিন্দ বলল, কোন লেখা-পড়া তো নেই।

প্রায় ক্ষেপে উঠে বলল বাড়িওয়ালা, এই আমার কথাই লেখাপড়া। নড়চড় হলেই একদম গেটআউট।

কালো বলল, গেঁয়ো হলেও রসিক আছে দেখছি। বলে বাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে—

হঁা—বানা এক কল্‌কে, বর্ষাটা নইলে জম্‌ছে না। বাড়িওয়ালা পিট্‌পিট করে একবার গোবিন্দকে ভ্রূর তলা থেকে দেখে নিল।

কালো চোখ টিপে গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করল, চলে নাকি ?'

গোবিন্দ এবার পা ছড়িয়ে বসে বলল, অভ্যেস টভ্যেস নেই, তবে দু-দিন থাকলেই চলবে।

কালো গাঁজা ডলতে ডলতে বলল, ঘুরে ঘুরেই দিন কাটে বুঝি, নইলে যখন যা তখন তা চলবে কেন।

গোবিন্দ বলল, দিনকালটাও দেখতে হবে তো। তা তোমার খ্যানায় থাকলে খ্যানার মত, ডোবায় থাকলে ডোবার মত। তখন কি আর জলে কাদায় গা ঘিনঘিন করলে চলে।

এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে একটা গালাগালির, চিৎকারের ও মারধোরের শব্দ উঠল। অমনি বাড়িওয়ালা লোমশ বৃহৎ বপু ঝাড়া-পাড়া দিয়ে উঠে বলল, সে দু-হারামজাদা লেগেছে, না ?

কালো বলল, তাছাড়া আর কারা ?

বাড়িওয়ালা তার মস্ত শরীরটা নিয়ে বনমানুষের মত প্রায় একটা অন্ধ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কালোও উঠল। গোবিন্দকে বলল, আর বাইরে কেন, চল ভেতরে।

কালোর পেছনে পেছনে গোবিন্দ সন্তর্পণে সেই দু-পাশে মাটির দেওয়ালের সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ভিতরে এসে পড়ল।

গোবিন্দ দেখল ভিতরে বাইরের চেয়েও তিনগুণ মেয়েপুরুষের ভিড়। উঠোনটাও লম্বা মন্দ নয়। তবে চওড়া একটু কম এবং তার সমস্তটাই কাদায় থিক্ থিক্ করছে—যাতায়াতের জন্যে মাঝে মাঝে পাতা রয়েছে ইঁট। সেই উঠোনটার চারপাশেই ঘর। ঘরে ঘরে লম্ফ নয় তো দলা পাকানো পাটের ফেঁসো মশালের মত জ্বলছে।

বাড়িওয়ালা তার শক্ত দু-হাতে দুটো জোয়ান ছোকরাকে ধরে রেখেছে। ছোক্‌রা দুটো তবু তড়পাচ্ছে, পরস্পরের প্রতি খিস্তি

করছে, হামলে হামলে উঠছে যেন দড়ি দিয়ে বাঁধা দুটো ষাঁড়ের মত।
কিন্তু যারা ভিড় করে আছে তাদের সকলের চোখ পড়ে আছে অন্যদিকে। যে ঘরের সামনে ঘটনাটা ঘটছে, সে ঘরের দরজার সামনে যে মেয়েমানুষটি নির্বিবাদে এবং কারোর দিকে না তাকিয়ে নিজের কাজ করে যাচ্ছে, সবাই সেদিকেই তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে।
গোবিন্দের পাশ থেকে কালো বলে উঠল, ওই মাগীটাই শালা যত গণ্ডগোলের গোড়া।
কথাটা কানে যেতে মেয়েমানুষটি খোঁচা খাওয়া সাপের মত চকিতে জ্বলন্ত চোখে ফিরে তাকাল।
গোবিন্দের মনে হল যেন সাপই বটে। চোখ দুটি কিঞ্চিত গোল এবং তার সে চোখের কেন পাতা নেই। নাকের পাটা দুটো বিস্তৃত ও মোটা। শরীরটা বেখাপ্পা লম্বা তালগাছের মত। একটা ফর্সা কাপড়ে যথেষ্ট ফিটফাট হলেও তার সমস্ত ভঙ্গিতে একটা নিষ্ঠুর কদর্যভাব ফুটে রয়েছে। তার মোটা মোটা ঠোঁট দুটো টিপতে গিয়ে তা আরও ছুঁচলো হয়ে উঠেছে এবং সেই ছুঁচলো ঠোঁটের উপরেই পুঁতির ছোটখাট নোলকটি নড়ে নড়ে উঠছে ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে।
বাড়িওয়ালা চিৎকার করে উঠল ছোকরা দুটোর প্রতি, থাম্, শালা যাড় কাঁহিকা।
কিন্তু ছোকরা দুটো যেন মেশিনে ফিট করা দুটো পিস্টন্ রড্। ওরা কেবলই পরস্পরের প্রতি এগিয়ে আসে আর শক্ত হাতের টানে ফারাক হয়ে যায়।
তখন বাড়িওয়ালা তাদের পরস্পরকে হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে খটাস করে কপালে কপাল ঠুকে গর্জে উঠল, তো লড় দেখি, কত লড়বি। আমিই লড়াচ্ছি তোদের।

বলে একটাকে কশাল ঘাড়ে এক রদ্দা, আর একটাকে কশাল পাছা বেড়ে এক জোড়া ঘুষি।

তখন দুটোই ঝপ্ করে বসে পড়ল মাটিতে। সকলে বলে উঠল, শালারা ঠাণ্ডা হল এতক্ষণে।

তবু তারা বাড়িওয়ালাকে মধ্যস্থ করে পরস্পরের প্রতি নালিশ করতে লাগল।

কিন্তু বাড়িওয়ালার নজর তখন গিয়ে পড়েছে সেই মেয়েমানুষটির উপর। বলল, এই ত্যাখ্ লোটন বউ, তোকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এখানে এসব খ্যামটা খেলা চলবে না।

লোটন বউ তার সেই পাতাহীন ঈষৎ গোল চোখে কুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে শান্ত ক্রূর গলায় জিজ্ঞেস করল, কী খেলা খেলতে হবে?

কোই খেলা নহি মাংতা। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ার মত দু-পা এগিয়ে তার রোষকুঞ্চিত ভ্রূর তলায় চোখ ঢেকে হিসিয়ে উঠল বাড়িওয়ালা, অওরত বলে খাতির নেই। বেশী বেচাল হলে—

মারবে? নির্মম শ্লেষে ঠোঁট উল্টে লোটন বউ তার তালগাছের মত শরীরটা একটা বিচিত্র দোলানীতে এগিয়ে নিয়ে এসে বলল, মার না দেখি একবার, কত তোমার তাগদ।

বাদ বাকি মেয়ে পুরুষ সকলেই প্রায় রুদ্ধশ্বাস অস্বস্তিতে লোটন বউ ও বাড়িওয়ালাকে দেখছিল।

বাড়িওয়ালার মুখের ও গলার সমস্ত পেশীগুলো মোটা দড়ির মত ফুটে বেরুল, গোঁফের পাশ দিয়ে দুটো ক্রূর রেখা উঠল কেঁপে কেঁপে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, যেদিন পাকড়াব, তোর টুঁটি ছিঁড়ে কুত্তার মুখে ফেলে দেব।

তারপর পেছিয়ে এসে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, হারামজাদী ডাইনী। অওরত যখন শয়তান হয়, তখন তার চালটা কি রকম হয় একবার দেখ।

আরও নির্মমভাবে বলে উঠল লোটন বউ, আরে যাও যাও, তোমার মত ভালো চালের আদমি আমি ঢের দেখেছি, এবং তার সেই কথার কোন প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বেই সে হঠাৎ ডাক ছেড়ে প্রায় মরা কান্না জুড়ে দিল। তাকে কান্না না বলে বলা চলে জেদী গলায় চিৎকার করে উঠল, আরে আমার তকদির……আরে আমার দিলটুটানো মিনসে, এমন দুশমনের কাছে তুমি আমাকে ছেড়ে গেছ। দেখ এসে একবার এরা তোমার অওরতকে আজ কেমন বে-ইজ্জতটা করছে।

এ ঘটনার এই হল দৈনন্দিন শেষ।

বাড়িওয়ালা তবু চিৎকার করে উঠল, তুই পারিসনে এই ষাঁড় দুটোকে ঠিক রাখতে—অ্যাঁ, পারিস্‌নে? রোজ শালা এক ব্যাপার, কাঁহাতক পারা যায়।

লোটন বউ সেই কান্নার ফাঁকেই চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল, আমি পারব না। ওরা জাহান্নমে যাক, ওদের হয়ে যারা বলে তারা জাহান্নমে যাক্। আমার কেউ নেই……সবাই দুশমন……

বস্তির মেয়েরা প্রায় সকলেই গজগজ করছিল, পুরুষেরা সকলেই হাসছিল মজা পেয়ে। কিন্তু এটা বেশ বোঝা যাচ্ছ লোটন বউয়ের জিভ্‌কে সকলেই কমবেশী ভয় করে।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন করুণায় তুতু শব্দে করে হঠাৎ বেসুরো গানের ভঙ্গিতে বলে উঠল,

ওহো, কেয়া বে-দরদ্ নানী, সব্‌কো দরদ্ বনা দে।

একটা চাপা হাসির হুস্ হুস্ শব্দে জায়গাটা মুখরিত হয়ে উঠল।

ঠিক ক্রোধ নয়, শাসানীর ভঙ্গিতে বলে উঠল বাড়িওয়ালা, এই চুপ, চুপ। হটাও ভিড় ঝামেলা।

যে ছোকরা দুটো মার খেয়ে বসেছিল, তারা এতক্ষণ চুপচাপ

গোল গোল চোখে সব দেখছিল এবং শুনছিল। এবার তারা আস্তে আস্তে দুজনেই লোটন বউয়ের কাছে গিয়ে বসল আর বিড়-বিড় করতে লাগল সান্ত্বনার সুরে, ছোড় দে……চুপ যা।

লোটন বউ তখন আঁচলে মুখ ঢেকে বাপ মা শ্বশুর স্বামী সবাইকেই সুর করে শাপশাপান্ত করে চলেছে এবং তার এই দুর্ভোগের জন্য যারা দায়ী তাদের সাতপুরুষের নরক বাস হয়, ভগবান যেন তার এই মিনতি রাখে। তারপর ছোকরা দুটোর বিড়বিড়ানি আর সইতে না পেরে হঠাৎ তাদের ঘুষি থাপড় মেরে চুল টেনে, খিস্তি খেউড়ের ঝড় তুলে ঘরে ঢুকে দড়াম্ করে দরজাটা দিল বন্ধ করে।

কালো গোবিন্দকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল, চলে এস ইয়ার, এ রোজকার ব্যাপার।

গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কি ?

কালোর বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, এই ছোকরা দুটো মৃত লোটনের ভাই হরিশ আর নন্দ। বউটা হল লোটনের বিধবা বউ। প্রথম কথা হচ্ছে বউটা নিশ্চয়ই খারাপ। খারাপ না হলে ভাই দুটো ওরকম ছিল না। মজালো তো দুজনকেই বা মজালো কেন। আর তাই হয়েছে কাল। এখন ছোঁড়া দুটো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে মরছে, বউটা বেশ বহাল তবিয়তে তাই দেখছে। সে যদি ঠিক থাকত তবে এরকম কিছুতেই ঘটতে পারত না।

গোবিন্দ বলল, তা, বউটার কোন দোষ তো নাও থাকতে পারে।

কালো হেসে উঠল বিদ্রূপের সুরে, বলল, যে কোন মরদই মেয়ে-মানুষের দোষ দেখতে পায় না। দু-দিন যাক্ তখন টের পাবে। এ সারা মহল্লার মানুষ ওকে চেনে……তুমি কি ভেবেছ ও রাত-ভর দরজা বন্ধ করে রাখবে? ঠিক কখন খুলে দেবে, তো বল,

যদি সাচ্চা হবে তো শালী কেন দরজা খুলে দেবে আর ওই জানোয়ার দুটোকে ঘরে তুলবে?······আর আমি তো শালা কোন ছার, মাইরি ভগবানও জানে না কি করে ওদের রাত কাটে।
বলতে বলতে সে দারুণ বিতৃষ্ণায় ও হতাশায় হাত ঝটকা দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে উঠল, সব শালা এলাকার দোষ, এ চটকল এলাকার। এখানে সব দুনিয়া ছাড়া কারবার, এখানে মানুষ নেই।
গোবিন্দ বলল, বাড়িওয়ালা ওদের ভাগিয়ে দিলে না কেন?
ও তো পাগল। কালো গলার স্বর পাল্টে চাপা গলায় বলল, নয় তো ওকে কেউ শালা গুণতুক করেছে। ওর কথা, ওর মেজাজ ভূত ছাড়া কেউ জানে না।······সবাই বলে ওদের ভাগিয়ে দিতে, বাড়িওয়ালা বলে, তাতে কী লাভ! আমার এখান থেকে চলে গেলে কি ওদের এসব খেয়োখেয়ি থেমে যাবে? ওদের এখানে রেখেই এসব বেতমিজি ঠাণ্ডা করতে হবে।···বোঝ ঠ্যালা।
গোবিন্দ অবাক হলেও বাড়িওয়ালার প্রশ্নটা হঠাৎ যেন তার কাছে মস্ত একটা আচমকা আলো-আঁধারির ঝাপসা রেখার মত দুলে উঠল। বিচিত্র সমস্যা ও নিছক সত্য কথা। কিন্তু কী এর বিহিত।
হাওয়ার ঝাপটায় আবার ফিস্ ফিস্ করে জল নেমে এল। হাওয়াটা রীতিমত শীত ধরিয়ে দেয়। মেঘের গ্রাসে সমস্ত আকাশটা কালো।
বস্তিটার মধ্যে একটানা চলেছে গান, কান্না, কথা। বিরামহীন এ হট্টগোলের মধ্যে মনে হয় যেন মাটির দেওয়ালের আড়ালকরা হঠাৎ কোন বাজারের মধ্যে এসে পড়া হয়েছে। তখনও পর্যন্ত লোটন বউয়ের অধ্যায় নিয়েই কিচিরমিচির হাসি ঠাট্টা গালাগালি চলছে।
সমস্ত গোলমালকে ছাপিয়ে একটা গুরুগম্ভীর বুড়োটে গলায় গিটকিরি বহুল গান ভেসে এল,

মন আমার নির্বাণ নগরে যদি যাবে,

সমভাবে ভাব সবে।······

গোবিন্দের থমকানি দেখে কালো তার হাত ঝাঁকানি দিয়ে বড় বড় চোখে বলে উঠল, এই মরেছে, তুমি এসব ফালতু কথা ভাবছ? তার চে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভালো। ছেড়ে দেও এসব, যাও হাতমুখ ধুয়ে এস।

গোবিন্দ সত্যিই হয়তো কিছু ভাবছিল। বলল, হ্যাঁ, কোথায় জল-টল পাব?

জল আর কোথায় পাবে। নয়া সড়কের মোড়ে একটা কল আছে। সেটা তো অনেক দূরে। বলে উঠোন থেকে বাড়ির ধার ঘেঁষা দোতালা বাড়িটা দেখিয়ে বলল, বাইরে দিয়ে ওই বাড়িটার পেছন দিকে যাওয়ার গলিতে যাও, নর্দমার জলে হাত পা-টা ধুয়ে এস।

নর্দমার জলে? গোবিন্দ একটু অবাক হল। নর্দমার জল কেন?

সে তো বস্তিবাড়ির জল নয়, ওই বাড়িটার যে জল নর্দমা দিয়ে যায়, সেই জল। খুব সাফা আছে। সাফা নর্দমা। খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল কালো কথাগুলি।

তোমরা সে নর্দমায় হাত পা ধোও?

তবে কি হরবখত ওই সড়কের কলে যাব?

গোবিন্দ তার জীবনে অনেক জায়গায় ঘুরেছে, মানুষ দেখেছে অনেক, জানে কিছু কিছু অনেকের অনেক হালচাল। সে এও দেখেছে ময়লা-খাটা মেথর ঝপ্ করে নর্দমার জলে হাত ধুয়ে বেমালুম ডালপুরি কিনে খায়। কিন্তু এরকমটা দেখেনি। সে বলল, পুকুর নেই কোথাও কাছে পিঠে?

না।

কিন্তু গোবিন্দ নর্দমার জলে হাতমুখ ধুতে গেল না। সে তার ঝোলা

ও লাঠি কালোর হাতে দিয়ে নয়া সড়কের জলকলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

খেতে বসেছে সকলে। কিন্তু কেউই সারিবদ্ধভাবে বসেনি। অল্প একটু জায়গার মধ্যে সকলেই প্রায় বসেছে জবুথবু হয়ে। এ্যালুমিনিয়াম বা লোহার থালা সকলের হাতে।······জায়গাটা অন্ধকার, একটি মাত্র রেশ এসে পড়েছে রান্নাঘরের লম্ফটার।

কালো রয়েছে রান্নাঘরে। যে যার খাবার দরজায় দাঁড়িয়ে নিয়ে এসে বসে পড়ছে। বাড়িওয়ালাও তাদের সঙ্গেই বসেছে, একটু দূরে রান্নাঘরের দরজাটার কাছেই।

গোবিন্দ একটা অন্ধকার কোণ থেকে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছিল।

সকলেই প্রায় চুপচাপ খাচ্ছে। খাওয়ার, জিভ্ নাড়ার ও হাত চাটার হুস্হাস্ ও অসমান কাঁচা মেঝেয় থালার ঠক্ ঠক্ শব্দের এক বিচিত্র ঐকতান উঠেছে। মাঝে মাঝে কেউ কেশে বা কথা বলে উঠছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এখানে বুঝি কোন মানুষ নেই, শ্মশানের বটতলার ঝুপসিতে একদল প্রেত নিঃশব্দ ফলারে বসেছে।

কে একজন আচমকা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, যাঃ শালা, থালা সাফ হয়ে গেছে।

অমনি একজন হি হি করে হেসে উঠে বলে, আন্ধারে খেতে বসার মজা আছে। কখন যে সব ফুরিয়ে যায়।

দীর্ঘ পথহাঁটা ক্লান্ত গোবিন্দের পেটভরা ক্ষুধা যেন একটা পাক খেয়ে থম্ ধরে গেল। এই অতৃপ্ত ক্ষুধার অবহাওয়ায় যেন বর্ষার অশান্ত হাওয়ার বেগও থেমে গেছে, মেঘ অনড় হয়ে গেছে আকাশে।······

উপোস এক কথা কিন্তু খেতে বসে ক্ষুধার অতৃপ্তি আর এক কথা। এবি হাভাতের আস্তানায় উঠেছে সে। মনটা তার বারবার বলে উঠল, চলে যেতে হবে, চলে যেতে হবে এখান থেকে।

কিন্তু কোথায়! পেছনে ফেলে আসা জীবনটা এক বিদ্রূপের খল্‌খল্‌ হাসিতে ভেসে উঠল তার সামনে, যে জীবনের ছবিতে অনাহার একটা একটানা চৌঘরা রেখার মত বেড় দিয়ে রেখেছে। সেই খল্‌খল্‌ হাসির তাড়ায় আজ আবার এসেছে সে এই চটকল শহরে, ছুটে গেছে ডায়মণ্ডহারবার থেকে তিনসুকিয়া, নোয়াখালি থেকে পশ্চিমের কয়লার খনিতে। মহারুদ্র মন্বন্তরের করাল থাবার ছায়ায় ঢাকা পথে পথে ঘুরে সব হারিয়ে, পঞ্চাশ সালের গলিত জনপদের উপর উধ্বর্শ্বাস প্রেতের মত পদে পদে আটকে যাওয়া পা জোর করে তুলে ছুটেছে সে। তবু আজও বুকের কোন্‌খানটায় ব্যথা ও জ্বালা বোধের একটা ছোট জায়গা রয়ে গেছে, যেখানে পথচলা জীবনের সব ধারা খট্‌ খট্‌ করে বারবার বেঁধে যায়।

হঠাৎ তার কানে এল বাড়িওয়ালার কর্কশ গলার শব্দ, এই-এই নগিনা, খালি থালাটা ঘাঁটছিস কেন, অ্যাঁ?

নগেন যেন চমকে উঠে বলল, কী বললে?

তোর মাথা। ......নে নে, আমি ছুটো দিচ্ছি...খেয়ে নে। বলে ঠকাস্‌ করে পাতে কি যেন দিল।

নগেন বলে উঠল তার স্বাভাবিক মোটা গলায়, থাক্‌ না বাড়িওয়ালা।

এহে, কোথাকার জামাই এল। কড়া ধমকের গলায় বাড়িওয়ালা বলে উঠল, লে লে, খেয়ে উঠে যা। ব্যাটা জম্মালি, তো এত বড় শরীরটা নিয়ে কেন?

তারপর হেঁকে উঠল, কই হে ফোর টুয়েণ্টি, আবার রাস্তা হারালে নাকি?

গোবিন্দের মুখে আবার সেই স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি ফুটে উঠল। কাছে এসে বলল, সব যে জেগে আছে।

বাড়িওয়ালা হাসল না কাশল কিছু বোঝা গেল না, কেবল একটা হুংকার শোনা গেল।

বাজিকর কাছে এসে সাহেবী কায়দায় সেলাম ঠুকে বলল, শোন বাবা ফোর টুয়েণ্টি, ভাতের ফেনটা রোজ আমার পাওনা। আমার পোষা সাপ তিনটে দুধের চেয়ে ফ্যানটাই বেশ খায়, বুঝেছ?

নগেন তার অবশিষ্ট গরাসটা মুখে তুলে বলল, হ্যাঁ ওর একটা মস্ত হেলে আর একটা বিঘত্‌খানেক ঢ্যাম্‌না সাপ আছে।

সদী বুড়ি বলল কোশো গলায় হেসে, ও আবার ঢ্যামন্‌টাকে দেখিয়ে লোককে বলে স্যাজ ক্ষয়া তক্ষক।

কথাগুলির উদ্দেশ্য তাদের নতুন বন্ধু গোবিন্দকে শোনানো। কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই কথাগুলো বাজিকরের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। সে হঠাৎ রেগে বলে উঠল, বিশ দাঁতগুলো ঝরিয়ে দিয়েছি, নইলে একবার মজাটা দেখিয়ে ছাড়তুম।

ওই যা দুখুঃ বলে নগেন উঠে গেল।

সদী বুড়ি হলেও প্রাণটা তার এদিক থেকে ডাঁটো রয়ে গেছে। সে বেশ খাপ্‌চি কেটে ধীরে ধীরে বলে, বিষ নেই বলেই তো চক্করঅলা সাপকেও ঢোঁড়া বলে, তাতে রাগের কি আছে! কী বল হে, ফোটোণ্টি না কি তোমার নাম।

বলেই সে চাপা গলায় হাসে খলখল করে। গোবিন্দ ভাবে, বাঃ বুড়ি ভারী মজার তো। তার সেই বহুদিনের আগের গাঁয়ের কথা মনে পড়ে যায়। সে ভাবে, এই আস্তানায় ও আবহাওয়ায় বুড়ির প্রাণটা এমন টাটকা রয়েছে কেমন করে!

কিন্তু বাজিকর ক্ষেপে ওঠার আগেই সদী বুড়ি চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাজিকর চেঁচিয়ে কিছু একটা বলার পূর্বেই গোবিন্দ তার হাত ধরে বলল, ছেড়ে দাও ভাই, বুড়ি মানুষ। আমি তো আর অবিশ্বাস করিনি।

বাজিকর একটু সন্দিগ্ধভাবে তাকাল গোবিন্দের দিকে। বলল, ফোর টুয়েন্টি লোক তুমি, তোমার কথায় কিছু বিশ্বাস আছে? আচ্ছা কালই তোমাকে সাপগুলো দেখিয়ে দেব, তখন বুঝবে।······আর আমাকে মিথ্যুক বলে লাভ কি? মাদারিখেলা, সেও তো এক ফোর টুয়েন্টি, হ্যাঁ এই তো সাদা কথা। লোকে কি ঘাস খায় যে কিছু বোঝে না!

নিশ্চয়ই। গোবিন্দ তাকে ঠাণ্ডা করতে চাইল।

কিন্তু বাজিকর থামল না।—আর ফোর টুয়েন্টি নয় কে বল? কোন শালা এসে আমার সামনে বলুক চারশ বিশ করেনি, পাঁচজুতি খেয়ে তার আমি মাদারিখেলাই ছেড়ে দেব।

কালো রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, কই গো প্রেমযোগিনী, ভাত নিয়ে যাবি, না-কি? ফুলকি, এই ফুলকি।

বাড়ির ওপাশ থেকে জবাব এল, সে তো বেহুঁশ। ঠাণ্ডার দিনে খুব টেনেছে পড়ে পড়ে।

কালো বলল, খোঁচা দিয়ে তুলে দে তো।

তারপর গোবিন্দকে ডাকল সে খেতে। বাজিকর আবার ফ্যানের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

বাড়ির উত্তর দিকটাতে একটা চেঁচামেচি পড়ে গেছে। সানুনাসিক জড়ানো একটি মেয়ে-গলার টেনে টেনে কান্নার মত শব্দটা ভেসে আসছে।

কালো বলে উঠল, এই সেরেছে ছুঁড়ি এখন আবার গান ধরেছে!

গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল, কে ও?

প্রেমযোগিনী।

মানে ?

মানে কি আর সব কথার আমরাই জানি? কালো বলল বিকৃত মুখে, বলেছি তো তোমাকে এ চটকল বাজারের মতিগতি ভগবানও জানে না। নাম ওর ফুল্‌কি কিন্তু হয়ে গেছে প্রেমযোগিনী। বলে ও নাকি খুব ভালো আর বড় ঘরের মেয়ে ছিল। পীরিতের মানুষ হারিয়ে অব্‌ধি ও পথে পথে ঘুরে শেষটায় এসে মরেছে এই চটকলে। শেষের দিকে কালোর গলার স্বরটা চেপে এল অত্যন্ত তিক্ততায়।—ছুঁড়ি মদ খাবে কাড়ি কাড়ি আর সন্ধ্যে হলে রোজ চেঁচিয়ে মরবে।······মা বাপ নেই······কোন কিছুর মা বাপ নেই। থাকবে কী করে? চটকলের কি মা বাপ আছে।

ফুলকির চেয়ে কালোর কথাগুলোই গোবিন্দের মনে লাগে বেশী এবং তার বারবারই মনে হচ্ছিল কথাগুলো কালো বল্‌ছে না। ওর ভেতর থেকে আর একজন একটা ক্ষতবিক্ষত গলা থেকে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

ফুলকির বেসুরো সরু গলার গান ভেসে এল, আমার কানুমণি মথুরায় গেছে······

এবং গেছে বলে সেই বিলম্বিত টান আর থামতে চায় না। মনে হয় সে বিলম্বিত টানের রেশ গান থেকে শেষটায় যেন কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

বাড়িওয়ালার গম্ভীর গলা শোনা গেল, ফুল্‌কি!

চট্ করে গান বন্ধ হয়ে গেল এবং দড়াম করে একটা শব্দ হল দরজা বন্ধের।

কালো বলল, নেও, হয়ে গেছে। আজ আর ও খাবে না।

কেন?

ওই যে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এরকম হয় ওর পেরাই।

পাগল নাকি? জিজ্ঞেস করল গোবিন্দ।

পাগল নয় কে? এক কথায় যেন সব মীমাংসা করে দিল কালো। ভাত দিল খেতে গোবিন্দকে।

প্রায় হামা দিয়ে কালোর সঙ্গে একটা খুপ্‌রির মধ্যে ঢুকল গোবিন্দ। ফস্‌ করে একটা দেশলাইয়ের কাটি জ্বালিয়ে কালো ধরাল একটা মোটা পাকানো পাটের ফেঁসো। মনে হল যেন দপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠল ঘরটাতে।

কালো বলল, তোমার বিছানাপত্তর কিছু আছে তো?

গোবিন্দ বলল, একটা গামছা আছে।

কালো বক্র ঠোঁটে ফিরে তাকাল, ও, তুমি দেখছি আর এক কাটি ওপরে। খালি নর্দমার জলে হাত ধুতেই যত গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ মন চেকনাই?

তা বলে নর্দমার জলে কারো যাওয়া ঠিক নয়।

কেন?

ব্যামো ট্যামো হতে পারে।

কালো হেসে উঠল এবং বোধ হয় এই প্রথম সে হাসল। হাসিটিও বড় বিচিত্র। ওপর পাটির সামনের দুটি দাঁত নেই, পাশের দাঁত দুটো ছুঁচলো ও লম্বা। তাতে হাসিটা তার খানিক জান্তব হয়ে উঠেছে।

ব্যামো? নর্দমার জলের হাত না ধুয়ে এখানে তুমি ব্যামো আটকাবে? বলতে বলতে তার চোখ দুটো যেন কোন বীভৎস দৃশ্য দেখে উদ্দীপ্ত ও বড় হয়ে উঠল।—কোথায় ব্যামো নেই? এই ঘরে, এর দেওয়ালে, চালে, মেঝেয়, সারা বস্তি, পথ, বাজার; দুনিয়াময়

থিক্ থিক্ করছে ব্যামো। ব্যামো আটকাবে তুমি?

গোবিন্দ কালোর হাত ধরে বলল, মানি ভাই তোমার কথা তবু আটকাতে হবে তো। নইলে মানুষ তো সাবাড় হয়ে যেত কবে।

হবেই তো। কালো যেন ব্যাধিগ্রস্ত বিকারের রোগীর মত বলতে লাগল, মানুষ তো সব সাবাড় হবেই, কে বেঁচে থাকবে? ব্যামো যে মানুষের মনে!

তাহলেও ব্যামো সারাতে হবে। মানুষ কত কষ্ট করে বাঁচতে চায়, দেখঁনি তুমি? গোবিন্দ বলল।

দেখিনি? পোড়া মাছের খাবি খাওয়া খুব দেখেছি।

গোবিন্দ এবার দৃঢ় গলায় বলল, মনে তোমার যাই থাক, কালো তুমিও বাঁচতে চাও। না চাও যদি তো খাও কেন, উপোস তো দেও না। বিষ মিশিয়ে খাওয়াও না কেন সবাইকে রান্নার মধ্যে দিয়ে? পোড়া মাছ তো মানুষ নয়, তুমি মানুষের কথা বল।

কালো একদৃষ্টে কিছুক্ষণ গোবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমাকেও ফোর টুয়েন্টি করছ, বোঝাচ্ছ আমাকে? আচ্ছা থাকো দু-দিন চটকল বাজারে, দেখ চোখ ভরে প্রাণের নিশানা—

থেকেছি আমি। দশ বছর আগে আমি এখানে কাজ করে গেছি।

একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়ে হঠাৎ যেন চুপসে যাওয়ার মত কালো চুপচাপ বসে পড়ল। না, গোবিন্দ দশ বছর আগে এখানে ছিল, সেজন্য নয়। সে মনে মনে বলে উঠল, গোবিন্দ বুঝবে না তার কথা, গোবিন্দ চিনবে না তাকে। একটা ঘাগী ভবঘুরে। সে কি করে বুঝবে তার কথা, যার জীবনে ঘর শুধু বার-বার ভেঙেই গেছে। বাঁচতে চাওয়াটাই কি বাঁচা! মরার মুখে কুটো আঁকড়ানো জীবন সার, তবে বেঁচে থেকে লাভ!

গোবিন্দও বুঝল কালো তাকে বিশ্বাস করেনি কিন্তু এও সে

বুঝল এ কালো আসল কালো নয়। এর ভেতরে আর এক কালো আছে, যে কালোর আনাগোনা বহু তলায়। যার হদিস সহজে পাওয়া যাবে না। সে কালোর প্রাণে বোধ হয় আছে কোন দগদগে ঘা, যার জ্বালায় নিয়ত সে মৃত্যুর দাপট দেখছে। বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে বাঁচার। সে তাকিয়ে দেখল কালোর দিকে।

দেখে মনে হয় আধবুড়ো, কিন্তু তত বয়স হয়নি সত্যি কালোর। মাথার চুলগুলো প্রায় সবই পেকে গেছে, শরীরটা যেন পাথরের মত শক্ত। মোটা মোটা হাড় বেরিয়ে পড়েছে খোঁচা খোচা পাহাড়ের গায়ের মত। চোখ দুটোতে তার এত ঘন ভাবের দ্রুত খেলা যে, তাকে চেনা ভারী মুশ্‌কিল।

সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কালো, তোমার আর কে কে আছে?

কেউ না।

সে কি! বাপ মাও নেই?

সে দুটো তো কবেই গেছে।

বে টে করনি?

একবার নয়, দু-বার।

কী হল তাদের?

যা হয়। কেটে পড়েছে।

মানে? মরে গেছে?

মরবে তো তোমাকে আর মানুষের মনের ব্যামোর কথা বলব কেন? আটকুড়ো নই, কয়েকটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল, সবশুদ্ধ শালা গায়েব হয়ে গেছে।

বলতে বলতে দপ্‌ করে জ্বলে উঠল আবার কালো।—অথচ কী না করেছি? জান কাবার করে দিয়েছি, তবু বাঁচতে চেয়েছি।

আমার সে মুখে শালা লাথি মেরে পর পর দুটো চলে গেল।······
কামাতে গেল চটকলে, আর এল না।

বলে সে হঠাৎ যেন যাদুকরের মত দাঁড়িয়ে উঠে কেঁসোর মশালটা হাত দিয়ে চেপে নিভিয়ে দিল। তারপর ধপ করে শুয়ে পড়ল মাদুরের এক কোণে। বলল, শুয়ে পড়।

গোবিন্দকে যেন কেউ মুখে উপর থাবড়া মেরে চুপ করিয়ে দিয়েছে। সে নির্বাক, নিস্পন্দ। তার বারবার ইচ্ছে করছে কালোকে দু-হাতে সাপটে ধরে সন্তানের মত বুকে চেপে রাখে। তার অনেক কথা হুড়মুড় করে ঠেলে আসতে লাগল গলায়। কিন্তু সে-সব কথা হয়তো অর্থহীন উপহাসের মত ঠেকবে এখন কালোর কাছে। কালোর যে প্রাণে সত্যিই আগুন লেগে গেছে! সে আগুনে দিশেহারা কালো দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে আর চারদিকেই দেখছে মানুষের চিতা পাতা রয়েছে পথে পথে ঘাটে ঘাটে।

আছে সত্য, কিন্তু গোবিন্দ দেখেছে মানুষ সে চিতা এড়িয়ে এড়িয়ে অন্য পথে চলেছে। কালোর বউয়েরা কি বুঝে শুনে কোন চিতায় পা বাড়িয়েছে, না অন্ধ জীবনের পোড়ানি থেকে, প্রেমহীন খোলা আকাশের সোয়াস্তি চেয়েছিল? কিন্তু কোথায় খোলা আকাশ জীবনের? তাকে যে আড়াল করে রয়েছে বেড়াজালের ঘেরাটোপ!

গোবিন্দের নিজের হারিয়ে-যাওয়া জীবনের ছবি ভেসে উঠতে লাগল অন্ধকারে······মায়ের প্রশস্ত কোল জোড়া মেটে বর্ণের হোঁতকা ছেলে, অমৃতভরাট পূর্ণ স্তন ঠাসা ছেলের মুখে। মায়ের আধবোজা চোখে অপূর্ব রহস্যময় হাসি, হাসি যে নামহীন বিচিত্র স্বপ্নের! এক কৌটা আগুনের মত সিঁদুরের টিপ কেঁপে কেঁপে উঠেছে। অদূরে গিন্নীর মত আঁট করে চুলের চুড়োবাঁধা ছোট্ট মেয়ে বেঁধেছে খেলাঘর। ······মায়ের সেই অপূর্ব চোখের দৃষ্টি আড়ে আড়ে দেখছে অদূরের

পেয়ারাতলার পুরুষের দিকে, করাতের ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে যে গোরুর গাড়ির চাকা বানাচ্ছে।

তারপর? এক দুঃস্বপ্নের ঝোড়ো ঝাপটায় সে ছবি গেছে ছিঁড়ে খুঁড়ে। শিশু হোঁতকা ছেলে যেন একটা রাক্ষুসে ময়ালের মত হাঁ করে খেতে চাইছে মায়ের কাছে, চুড়ো বাঁধা মেয়ে খেলাঘর ভুলে টেনে টেনে ছিঁড়েছে মায়ের কাপড়, শূন্য জঠর মা কাঠির মত শরীরটা নিয়ে দাপিয়ে মরেছে উঠোনে। গোরুর গাড়ির ভাঙা চাকায় মুখ দিয়ে পড়ে আছে পুরুষ···

তারপর যেন কোন অদৃশ্য দানবের থাবার ঝাপটায় এক একটাকে টেনে টেনে নিয়ে গেল। কেবল রয়ে গেল পেয়ারাতলার ছুতোর।···

তাদের সেই চলে যাওয়ার সঙ্গে কালোর বউয়েদের চলে যাওয়ার ফারাক কতখানি? দুজন গেছে বেড়াজাল থেকে বেড়াজালেই মুক্তির সন্ধানে আর এদের মেরেছে বেড়াজালের রুদ্ধশ্বাস চাপ।

গোবিন্দ ডাকল, কালো!

কালো জবাব দিল, বল!

গোবিন্দ বলল, মানুষের বড় পোড়ানি। সে পোড়ানিতে সব আঘাটে মাঘাটে জল খোঁজে। যদি ঘোলা জলে গিয়ে পড়ে, তাকে দোষ দিও না।

কালো জবাব দিল না।

বাইরে কোথায় খট্‌ করে একটা দরজা খোলার আর আবার বন্ধ করে দেওয়ার শব্দ হল।

কালো বলে উঠল, ওই শোন লোটন বউ দরজা খুলে সে দুটোকে ঘরে নিয়ে গেল। এর পরে শোনা যাবে ফুলকির গালাগাল।

কেন?

ও এক প্রেমযোগিনী, আবার ওর প্রেমে যে হাবুডুবু খাচ্ছে অনেকে। তারা গিয়ে দরজায় টোকা মারবে।

তারা কারা ?

এ বাড়িরই লোক।

তা, ফুলকি দরজা খোলে না ?

তবে আর তোমাকে বলছি কি। সব তো মনের ব্যামো। এদিকে রাতদিন প্রেমের কথা, কিন্তু কে যে ওর পীরিতের লোক, তা ভগবানই জানে। বেওয়ারিশ ছুঁড়ি······মর্জিতে চলে। খাবে কোন্ দিন শকুনেরা ছিঁড়ে। একে বলে চটকল বাজার।

পরদিন গোবিন্দের ঘুম ভাঙল শ্বাস টান লেগে। নিশ্বাস না নিতে পেরে সে ধড়ফড়িয়ে উঠল। কিন্তু সব অন্ধকার। পাশে হাঁতিয়ে দেখল কালো নেই। একটা সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে দরজার দিকে। সে তাড়াতাড়ি সেদিকে ছুটে গেল।

বাইরে এসে ও দেখল সব ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। হঠাৎ এত ধোঁয়া এল কোত্থেকে ? সে ভালো করে তাকিয়ে দেখল, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সমস্ত ঘরগুলো থেকেই প্রায় ধোঁয়া বেরুচ্ছে, উনুনে আগুন দিয়েছে সব। আকাশটা পর্যন্ত দেখা যায় না। হাওয়া নেই। চারদিকে কেবল ধোঁয়া, ধোঁয়ার গায়ে যেন আঠা মেখে দিয়েছে, তার নড়বার উপায় নেই। সমস্ত জগতটা যেন ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে।

মনে হয় যেন জমাট কুয়াশায় ঠাসা চারদিক। ছেলেবেলায় একবার গোবিন্দ শুনেছিল, নরকটা নাকি ধোঁয়ায় ভরা। পাপীদের শাস্তির জন্য সেখান থেকে স্বর্গ দেখা যায় না আর সেই ধোঁয়া থেকে আচমকা এক একটা বিদ্‌ঘুটে প্রেত হাঁ হাঁ করে এগিয়ে আসে। এ যেন সেরকম হঠাৎ কারো মুখ দেখা যাচ্ছে, কিংবা কেউ হুস্ করে ধোঁয়ার ঝাপ টা দিয়ে চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে।

গোবিন্দ লক্ষ্য করে দেখল, আস্তে আস্তে পেটভরা ময়ালের মত ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে সরছে। বুঝি হাওয়া লেগেছে। সে বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করল……এই ধোঁয়া ঠেলে উঠবে আকাশের চাপ বাঁধা মেঘ সরিয়ে, তারপর আবার সে ধোঁয়াকে তাড়া করে নিয়ে যাবে দক্ষিণ বাতাস।

হঠাৎ বাড়িওয়ালার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনল সে, বেরো, পুঁটকে খচ্চরের দল।

অমনি উঠোনের এধার ওধার থেকে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুড়দাড় করে ছুটে যেতে লাগল বাইরে যাওয়ার গলিটার দিকে। কেউ ন্যাংটো, কেউ ইজেরটা কোমরের কাছে ধরে কিংবা পাছা থেকে জামা গুটিয়ে।

একটা মেয়ে গলার খিল খিল হাসি শোনা গেল

বাড়িওয়ালা আবার চিৎকার করে উঠল, যার যার বাচ্চারা টাট্টি করেছে, তারা সব উঠোন সাফ করে দেও।

বলে সে বেরিয়ে গেল।

গোবিন্দও গেল তার পেছন পেছন বাইরে। বাইরে এসে দেখল দোতলা বাড়িটার ছাদ থেকে দুটো ছেলে বেধড়ক ঢিল ছুঁড়ছে পেছনের নর্দমাটার দিকে।

গোবিন্দ সেদিকে গিয়ে দেখল ছেলেমেয়েগুলি ন্যাংটো হয়ে নর্দমায় বসেছিল। ঢিলের তাড়া খেয়ে আবার ছুটেছে সড়কের দিকে। সড়কের উপর যমদূতের মত দাঁড়িয়েছিল মেথর একটা। সে হেঁকে উঠল, খবরদার, রাস্তায় বসলেই ঠ্যাঙাব।

কিন্তু শিশুদের দেহের ভিতরের সে বেগ আর আটকে রাখার উপায় ছিল না, তারা সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে বসে পড়ল রাস্তার ধারে ধারে।

মেথরটা একে তাড়া করে তো আর একটাকে পারে না। এমনি করেই বাচ্চাগুলোর প্রাতঃকৃত্য শেষ হয়। তখন কারো ঠ্যাঙে কারো পায়ে লেগে থাকে বিষ্ঠা। আবার ছোটে জলের সন্ধানে। ঠিক এ সময়েই চটকলের ও অন্যান্য কারখানার ভোঁ। গোঁ গোঁ করে চিৎকার করে ওঠে।

কাণ্ড দেখে গোবিন্দের যেন দম আটকে এল। দেখল, তার পাশে দাঁড়িয়ে বাড়িওয়ালাও ভ্রূ কুঁচকে সে দৃশ্য দেখ্ছে আর আনমনে গোঁফ টানছে জোরে জোরে।

গোবিন্দ বলে ফেলল, একটা পায়খানা নেই?

ভ্রূ জোড়া আরও খানিক কুঁচকে বলল, হ্যাঁ, আশমান থেকে পড়বে।

কেন, বানানো যায় না?

কী করে?

এই ইঁট দিয়ে, জনমজুর খাটিয়ে।

তোমার কাছ থেকে তা শিখতে হবে? প্রায় ধমকে উঠল বাড়িওয়ালা। —মিসিপাল্‌টির হুকুমটা কে দেবে অ্যাঁ? তুমি?

ও! সে কথাটা গোবিন্দ ভুলেই গিয়েছিল।—দেয় না কেন?

কেন দেবে? অফ্‌সরের ঘুষের টাকা না দিলে? বলি ঠিকে জমিতে মিসিপাল্‌টির মেথর খাটবে না। বলতে বলতে সে রকের উপর তার সেই খাটিয়াতে বসে আপন মনেই বক্ বক্ করতে লাগল, আর আমি যদি শালা মানুষের বাচ্চা হই, এক আধেলাও ছাড়ব না। আর পায়খানা আমি করবই, জলকলও আনবই, দেখি কে আমাকে রোখে।

বলে ভ্রূর তলা থেকে একবার চকিতে গোবিন্দকে দেখে হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকল। গোবিন্দ কাছে এলে দেখা গেল তার ভ্রূ দুটো উঠে গিয়ে বিচিত্র দুটো স্বপ্নভরা চোখ বেরিয়ে পড়েছে।

মুখের সমস্ত কোঁচগুলো কোথায় পালিয়ে গিয়ে একটি শান্ত মুখ বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। এদিক ওদিক দেখে সে বিস্মিত গোবিন্দকে আরও কাছে ডেকে ফিসফিস করে বলল, এটা আমি পাকা বাড়ি করব, ইঁটের গাঁথনি আর ছাদ দিয়ে। হাঁ তার আগেই জলকল আর পায়খানাটা আমি করে ফেলব, কী রকম হবে?

বলেই একটু হেসে ফেলে আবার বলল, এই এদেরই আমি রাখব, যারা এখনও আছে। আমি তো ওরকম ছিঁচকে চোর বাড়িওয়ালা নই, বিরিজামাহনও নই, সেজন্য আমার সঙ্গে কারো বনে না। তা এরা এসব বোঝে না। রাম! রাম! ভাড়ার টাকাটাও ঠিকমত 'কেউ দেয় না। কিন্তু বস্তি নাম আমি ঘোচাবই—হাঁ।

আচমকা কাছেই কোত্থেকে সদীর গলা শোনা গেল, সে কথা তো বিশ বছর ধরে শুনে আসছি, হয় না তো।

একেবারে এক কড়া গরম দুধে এক ফোঁটা লেবুর রস পড়ে ছানার মত কুঁকড়ে দলা পাকিয়ে গেল বাড়িওয়ালার মুখটা। তীব্র দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল গোবিন্দের মুখে কোন ভাবান্তর ঘটছে কিনা। ফুঁসে উঠে বলল, এবার দেখ, দেখ ও আমাকে কোনদিন পুরো ভাড়া দেয় না। আবার আমাকে বিশ বছরের কথা শোনাচ্ছে। একদিন ধরব এক একটাকে, আর গলা ধাক্কা দিয়ে বের করব। ঠিক, দেখে নিও।

গোবিন্দ এতক্ষণ প্রায় ভ্যাবাচাকা খেয়েছিল। সে সত্যি কল্পনা করবার চেষ্টা করছিল যেন, এ বস্তিটা নেই, একটা সুদীর্ঘ এক-তলা বাড়ি উঠেছে, হলদে তার রং। পায়খানার ছাদটা দেখা যাচ্ছে, ছড় ছড় করে জল পড়ছে ঝকঝকে পরিষ্কার মেঝে। সামনে মাঠ—নয়া সড়ক হয়ে গেছে পিচের রাস্তা।

সদী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, তা তোমার ঠিকে জমির উপর বাড়ি বানাতে দেবে কেন? পায়খানার হুকুমই বা মিলবে কী করে?

বাড়িওয়ালা বলল মুখ ভেংচে, ঠিকে বুঝি মৌরস করা যায় না?

তেমনি গলায় বলল সদী, হ্যাঁ, যাদু মন্তরে মৌরস হবে। আগের জমিদারের আমলে তো হয়েছিল মৌরস। নতুন মালিক তো আবার ঠিকে বানিয়ে দিলে। কী করলে তুমি?

হঠাৎ কোন জবাব না আসাতে বাড়িওয়ালা নিজের উপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল কি সদীর পরেই রেগে গেল বোঝা গেল না। চেঁচিয়ে উঠল, আমি টাকা দিয়ে মৌরস করাব, টাকা দিয়ে, বুঝেছ?

সদী একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, তোমার গাছ আছে টাকার। যখ্ দিয়ে রেখেছ যে।

গোবিন্দ কি একটা বলতে চাইল। তার আগেই বাড়িওয়ালা খেঁকিয়ে উঠল, টাকা কি আমার কোনদিন হবে না? কোথাকার উল্লুক মেয়েমানুষ!

সদী নির্বিকারভাবে ঠোঁট উলটে বলল, সে তোমারমত বাড়িওয়ালাকে দিয়ে হবে না।

চোপ্, চোপ্রাও। বলে ধমকে উঠল বাড়িওয়ালা। হয় কি না হয়, দেখিয়ে দেব। তুই তোর ভাড়াটা মিটিয়ে দিস্।......শালা কারো সঙ্গে আর মহব্বত রাখব না!

বলে উঠে বাড়ির ভিতর চলে গেল। সেখানে আবার কিসের একটা গোলমাল চলছে।

সদী বুড়ি চোখ মটকে হেসে বলল গোবিন্দকে, একটা পাগল!

গোবিন্দ খানিকটা বোকার মত বলল, পাগল?

সদীর রেখাবহুল মুখটা কুঁচকে যেন ছোট হয়ে গেল। একটা

নিশ্বাস ফেলে বলল, তাছাড়া আর কী বলব? এ সংসারে ওর মত মানুষ কেন জন্মায়, তাই ভাবি।······ওর ওই অসুরের মত শরীলটা দেখলে লোকে ভয় পায়। আমি দেখি, ও একটা ছ-মাসের বাচ্চা, হ্যাঁ······।

বলতে বলতে সদী কেমন অস্বস্তিতে ছটফটিয়ে ওঠে। তার কুঞ্চিত চামড়ায় ঢাকা চোখ দুটো বড় করে, মাটিতে দাগ কষে বলল, কেন? না, ওর মাথাটা একেবারে গোবরে ঠাসা। নইলে ভাবো এ বস্তির ভাগাড়কে কিনা ও সগ্‌গ বানাতে চায়, বলে পাকা বাড়ি তুলবে। আরে আজ বাদে কাল তোকে কোথায় উঠে যেতে হবে, [illegible] মত হারামজাদা বস্তি মালিকরা রাতদিন তোর সব্বোনাশের সিঁদ খুঁড়ছে আর ও মেতে আছে ওর নেশায়। কি? না, আমি সবাইকে ভালো রাখব, পালন করব রাজার মত।

রাজার মত? গোবিন্দ প্রায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

গলার ভেতরে একটা অদ্ভুত শব্দ করে বলল সদী, তবে আর তোমাকে বলছি কি। সে পাগলামি তো তুমি শোননি। ও যে নিজেকে রাজা ঠাউরে বসে আছে।

বলে সদী বুড়ি হঠাৎ চুপ হয়ে গিয়ে পশ্চিমের মেঘভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তার বুড়োটে গলায় বলতে আরম্ভ করল, কে ভেবেছিল ও আবার এত বড়টা একদিন হবে, বিদেশে এসে বাড়িওয়ালা সেজে বসবে!···গাঁয়ে ওকে সেদিন জন্মাতে দেখলুম। এ্যাই সেদিনের কথা, পাটোয়ারী দিনে দুকুরে ওদের ঘর জ্বালিয়ে দিল, খুন হয়ে গেল ওর বাপটা। কার বা কানুন, কে বা বিচার করে!···ওর মা খাপসুরত জোয়ান অওরত, ওকে কোলে করে ভেগে গেল একটা সাধুর আড্ডায়।···ভগমানের ডেরা। এ তো তখন দু-এক বছুরে বাচ্চা।······বলে সদী বুড়ি হেসে

উঠল, না তীব্র বিদ্রূপে হু হু করে উঠল বোঝা গেল না। গোবিন্দের দিকে ফিরে বলল, সে ভগমানের ডেরায় গিয়ে ওর মা বছরে বছরে একটা করে মরা বাচ্চা বিয়োতে শুরু করলে।, গাঁয়ের নজ্‌দিক তো, আমরা দেখতে যেতুম। জানের ভয়ে বেচারা মুখ খুলতে পারত না।···তারপর দশ বছর বাদে মাগী মরে গেল। সে মড়াটা তো আর সাধুরা ছুঁতে পারে না, ডোম দিয়ে ভাসিয়ে দিলে জাহ্‌নবীর কোলে। জাহ্‌নবী ?···

সদীর গলা মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। এক চিমটি রোদ উঁকি মেরেছে মেঘের ফাঁকে। সে আলোয় হাওয়ার গায়ে হঠাৎ নেমে আসা ইলশেগুঁড়ির ছাট যেন অজস্র মুক্তোকণার মত ঝিকমিকিয়ে উঠল। বি, টি, রোডের সারবন্দী কারখানা থেকে ভেসে আসছে মূর্ছিত গোঙানির শব্দ।

সদী উত্তেজিত গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল, মা মরল তো কি হল কম্‌লি যে ছোড়তা নহি। ওর মার ব্যাপারটা সাধুরা ছেলেকে দিয়ে পুষিয়ে নিতে লাগল। তখন ও বেশ নাদুস নুদুস ছেলেটি। ওকে সাধুরা······

গোবিন্দের বিস্মিত কৌতূহল ভরা চোখ ও থ-মারা মুখের দিকে তাকিয়ে বন্ধ হয়ে গেল সদীর গলা। আপন মনে মাথা নেড়ে সে কি সব বিড় বিড় করতে লাগল। কুঞ্চিত গালের ভাঁজে ভাঁজে নেমে এল জলের ধারা।—বেচারা অবুঝ বাচ্চা···যেন সীতার লব কুশের একটা। মনে মনে মহাদেওকে ডেকে বলতুম, হে দেওতা এ সন্‌সারের হর্‌ আদ্‌মির যৌবন তুই খাক্‌ করে দে! থু থু··· মানুষ এত বড় জানোয়ারও হয়।

গোবিন্দ উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হল ?

কী আর হবে। ওকে কয়েদীর মত সাধুরা রেখে দিল, কারো

সঙ্গে বাত-পুছ করতে দিত না।…তারপর, ও নিজেই একদিন কোথায় পালিয়ে গেল, তা আমরাও জানতুম না।…বহুৎ দিন বাদ বাংলায় এলুম। হাওড়া বজ্‌বজ্‌ ঘুরে এখানে এসে দেখা মিলল। দেখি, বাড়িওয়ালা বনে গেছে। আমাকে পেয়ে খুব খুশি। খুশি হলে কি হবে, আমি খুশি হইনি। কেন? না ওর পাগলামি দেখে। হেন বাড়িওয়ালা নেই যে ওর দুশমন্ নয়, ওর নতুন জমিদার ওকে কাবু কররার তালে আছে। সবে এসেছে, এখন দেখবে একা বিরিজামোহনই ওকে পাগল করে দিতে পারে। ও যে একেবারে বোকা…বোকা! ও যদি বাড়িওয়ালার মত বাড়িওয়ালা হত!…পাগল! এ ঠিকে জমি আর কদ্দিন! ওকে আবার ভাসতে হবে…।

গলাটা বন্ধ হয়ে এল সদীর।

কিন্তু গোবিন্দের চোখের উপর কেবল বাড়িওয়ালার সেই শান্ত ও স্বপ্নভরা মুখটা ভেসে উঠছিল। পাগল, কিন্তু একি দুরন্ত পাগলামি, একি অদ্ভুত বাসনা মানুষটার মনে!

বাড়ির মধ্যে গণ্ডগোল শোনা গেল। তারা দুজনেই ভিতরে এসে দেখল, সব মেয়েমানুষই প্রায় মারমুখো হয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়েছে। কারণ, উঠোনের বিষ্ঠা কে পরিষ্কার করবে, তাই হল সমস্যা। কার বাচ্চা এখানে মলমূত্র ত্যাগ করেছে, কে বলতে পারে? বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করতেই তারা একযোগে কলের পুতুলের মত বলে ওঠে তারা কেউই নয়।

তারা মায়ের মন চেনে, সুতরাং স্বীকার পাওয়া অসম্ভব। যেন উঠোনটা তাহলে নোংরা করেছে ভূতে!

কিন্তু বাড়িওয়ালা সে সব প্রমাণের ধার দিয়েও গেল না। সে হঠাৎ বউগুলোকে ঠেলে ঠেলে দিতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, সব

জেনানাকে সাফা করতে হবে, কোন বাত-পুছের দরকার নেই। চালাও, চালাও।

এও দৈনন্দিন ব্যাপার। মেয়েরা সব চিৎকারে কান্নায় গালাগালিতে আকাশ ফাটাতে ফাটাতে উঠোন পরিষ্কার করতে লাগল আর প্রত্যেকেই তার নামহীন শত্রুকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, সে যদি অপরের বাচ্চার ময়লা সাফ করে থাকে, তবে যেন সে বাচ্চা আজই দেবতার মুখে যায়; এবং পরিষ্কার হওয়ার পরই শুরু হয় বাচ্চা-গুলোর উপর পীড়ন মারধোর।

শিশুদের চিৎকার মায়েদের গালাগালিতে একটা প্রচণ্ড হুলুস্থূল শুরু হয়ে গেল।

বাড়িওয়ালা একমুহূর্ত তা দেখে গোবিন্দকে বলল, দেখ একবার কাণ্ডটা। আর আমি এদেরই জন্যে পাকাবাড়ি বানাতে চাইছি।

তারপর গলার স্বরটা পরিবর্তন করে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, তখন আর বোধ হয় এসব হবে না—ঠিক বন্ধ হয়ে যাবে। কী বল তুমি? নির্বাক গোবিন্দ বাড়িওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাড়িওয়ালা চলে গেল বিকৃতমুখে বিড়বিড় করতে করতে।

গোবিন্দের হঠাৎ নজর পড়ল লোটন বউয়ের উপর। লোটন বউ হাসছে তার সেই মোটা মোটা ঠোঁট বিস্ফারিত করে। বুকের পাটা ফুলিয়ে বাচ্চাদের ক্ষিপ্ত মায়েদের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু চোখে তার কোনও ভাব নেই। যেটা আছে সেটা ভাব নয়, নিষ্পলক একজোড়া চোখ কাঁচের মত ছায়াহীন, শুধুমাত্র দেখবার জন্যই। বিচিত্র আনন্দ লোটন বউয়ের। এদের এ জ্বালা যন্ত্রণায় তার এত খুশির কী আছে! তাকে উঠোন পরিষ্কার করতে হয় না, তাই কি?

গোবিন্দের সারা গায়ের মধ্যে রি রি করে উঠল লোটন বউয়ের হাসি দেখে।

লোটন বউয়ের হঠাৎ নজরে পড়ল গোবিন্দকে। চকিতে হাসি মিলিয়ে গিয়ে সেই অপলক দৃষ্টি পুরুষের দিকে তাকাল। কালকের গণ্ডগোলে গোবিন্দকে সে দেখেনি। তার তালগাছের মত শরীরটাকে সে স্বভাবসিদ্ধ একটা দোলানি দিয়ে এক পা পেছিয়ে ঠোঁট উলটে বলল, ও মা এটা আবার কে রে?

গোবিন্দ চকিতে তার সেই স্বাভাবিক হাসিটি নিয়ে বলল, গোবিন্দ শর্মা, তোমাদের নতুন মানুষ।

এলাকার পরিবেশে আশ্চর্য রকম ফর্সা ও পাতলা সাড়ীটা গায়ের সঙ্গে আরও ভালো করে লেপটে, নাক কুঁচকে লোটন বউ প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, ও মা! কে ওর নাম জিজ্ঞেস করেছে। সরে যাক না এখান থেকে।

তা যাচ্ছি লোটন ঠাকরুন। বেশ ভয়ে ভয়ে বলল গোবিন্দ, আমি তোমার দেওর হই কিন্তু, বুঝলে ঠাকরুন!

আ মলো যা! মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল লোটন বউ, ওসব কথা যেসব মেয়েমানুষে ভালবাসে মিনসে তাদের কাছে যাক না।

গোবিন্দ বলল হেসে, হেঁ হেঁ, বউদিকে কেউ খারাপ কথা বলে? নন্দ-হরিশ যে আমার দোস্ত হয়।

তাই! আরও খানিকটা বিষ দিয়ে বলল লোটন বউ, ওই কমিনা ছুটোর বন্ধু বলে এরকম নির্লজ্জ।

এবার গোবিন্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। লোটন বউ যাদের খায়, যাদের পরে, তাদেরই এমন ঘৃণা করে। ভালবাসার কথা না হয় বাদই গেল। সামান্য করুণা না থাকলেও কেমন করে সে সেই কমিনা কুকুর ছুটোর সঙ্গে ঘর করে! অথচ যাদের সে কুকুর বলে, তাদের উপর দাপটখানি তারই আছে, তারা তো ওই পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করেই বসে আছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হল, লোটন বউয়ের জীবন ধারণের ভাবনাই হয়তো বড়। সেই তাগিদেই হয়তো সে এরকম ঘৃণ্য জীবন বেছে নিয়েছে।

নন্দ-হরিশকে সে মারুক ধরুক, লড়িয়ে দিক পরস্পরের মধ্যে, ঘৃণা করুক, তবু হয়তো তাকে বাধ্য হয়েই এঘরে থাকতে হয়। বেশ্যারা কি কখনো তাদের রাত্রির হাজারো অতিথিদের কাউকে ভালবাসে! পয়সা দিয়ে যারা ধরিত্রীর অনির্বচনীয় সুধাকে পান করতে যায়; হাজার হোক পয়সার যুগ, ধরিত্রী কি সেখানে সুধাভাণ্ডের প্রলেপ দিয়ে বিষভাণ্ডই তুলে ধরে না! তারাও কি লোটন বউয়ের মত মনে মনে তাদের কমিনা কুকুর বলে ক্লেদাক্ত ভার বহন করে না! নিরন্তর প্রেমহীন জীবন, তাই তো সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

লোটন বউয়েরও কি তাই? আবার ভাবল গোবিন্দ, কি জানি, হয়তো যে কথা তার গালাগাল মনে হল, সে কথাই নন্দ-হরিশের কাছে সোহাগের সুরঝংকার হয়তো।

এইসব ভাবতে ভাবতেই সে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল। কলকারখানার লোকজনেরা সকলেই বেরিয়ে গেছে। মেয়েরা কেউ বেরুচ্ছে ঝুড়ি মাথায় বগলে করে কয়লা আর গোবর কুড়াতে। বেশীর ভাগই ছোট মেয়ে, ছোট ছেলের দলও আছে তার মধ্যে। রান্নাও শুরু হয়েছে কোন কোন ঘরে। ধোঁয়ার সেই আঁকড়ে-ধরা ঘন ভাবটা অনেকখানি কেটে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

ছ্যাকড়া মেঘের ভিড় আকাশে। বৃষ্টি নেই, মেঘলা ভাঙা রোদ ছায়ার ধারে ধারে উঠছে হেসে।

গোবিন্দের চোখে পড়ল কালো কি যেন এক হাতে নিয়ে আর এক হাতের আড়াল করে, দ্রুত একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। অবাক হল গোবিন্দ, ভারী কৌতূহল হল তার। কালোর আবার

কিসের এত লুকোচুরি। এক পা এক পা করে সে কালো যে ঘরে ঢুকেছে, সেই ঘরের দিকে গেল। কাছে এসেই কালোর গলা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে শুনল কালো ডাকছে, ফুলকি, এই ফুলকি, ওঠ্ ওঠ্ জলদি।

ফুলকির ঘুমন্ত গলা শোনা গেল, কী বলছ।

কলে যাবিনি? কবে বাঁশী বেজে গেছে যে।

বিরক্ত ফুলকির গলা ভেসে এল, আ মলো! তাতে তোমার কি? ভাগো, ভাগো।...

মুহূর্ত চুপ চাপ। আবার কালোর খানিকটা খুশি মাখানো হুতোশের গলা শোনা গেল—খাবিনি? তোর ভাত কাউকে দিইনি ছাখ, রেখে দিয়েছে মাইরি! খেয়ে নে।

ফুলকির ঘুমন্ত গলা সতেজ হয়ে উঠল, মাইরি! তার উঠে বসার শব্দ শোনা গেল কাপড়ের খস্ খস্ ও চুড়ির বাজনায়। গোবিন্দ কৌতূহল না চাপতে পেরে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখল।...আধো অন্ধকার ঘরটাতে আগুনের নীল শিখার মত শ্যামা ফুলকি, ঘুমের জড়তা নিয়েও একখণ্ড ইস্পাতের মত জ্বল জ্বল করছে। শক্ত পুষ্ট বন্য ঢেউ তোলা শরীর। বিস্রস্ত বেশবাস। জামার বোতাম খুলে গিয়ে বুকের বঙ্কিম রেখা উঁকি মেরে আছে। কপালের টিপটা গেছে খানিক বেঁকে, রুক্ষ চুল এলোমেলো হয়ে পড়েছে ছড়িয়ে। কোনরকমে উঠে বসে কালোর দেওয়া ভাতগুলো গিলছে গপ্ গপ্ করে। মুখের ভাত না গিলেই বলছে, উঃ কী খিদেটাই পেয়েছিল।

কালো যেন দেবীদর্শনের মত হাঁটু গেড়ে তার কাছে বসেছে এবং অদ্ভুত করুণায় বেদনায় ও আনন্দে মগ্ন হয়ে চেয়ে আছে ফুলকির দিকে।

বলল, কেন খেয়ে নিস্ না সন্ধ্যেবেলা। কত বারণ করি, তবু রোজ সরাপ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকবি।

·সে কথা ছাড়। কালোর দিকে না তাকিয়েই ফুলকি বলল, একটু জল দেওতো।

কালো তাড়াতাড়ি উঠে গেলাস না পেয়ে কলসীটাই নিয়ে এল। বিনা বাক্যে ফুলকি হাঁ করল, কালো একটু একটু করে জল ঢেলে দিতে লাগল তার মুখে। মদমত্ততার রাতভর পিপাসা আর মিটতে চায় না ফুলকির। ফুলকির সঙ্গে সঙ্গে কালোও ঢোক গিলছে। যেন সেও জল পান করছে। জল গলায় বুকে বেয়ে পড়ল ফুলকির।

পিপাসা মিটলে চোখ বুজে একটা আরামের শব্দ করে উঠল ফুলকি, আঃ! বাঁচলাম!

কালো কলসীটা রেখে উঠল, বাঁচলি না ছাই। তোর মরণ কেউ কি আটকাতে পারবে?

তা এমনি করে না হয় মরেই গেলাম, আরাম করে তো মরব। বলে হেসে ফেলে ফুলকি।

কালো অপলক চোখে আবেগ নিয়ে তাকিয়ে রইল।

ফুলকি ঠোঁট টিপে চোখ পাকিয়ে বলল, আবার তুমি ওরকম পাগলের মত তাকিয়ে আছ?

দেখি তোকে, ভাবি কেন তোর মরতে প্রাণ চায় ফুলকি?

মরণে যে সুখ আছে।

কি সে মরণ?

ফুলকি ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, তুমি তো সেরকম ক-বারই মরেছ।

ব্যাকুল গলাটা বুঝি কালোর কেঁপে উঠল। বলল, তবে আবার মরব।

ফুলকি খিলখিল করে হেসে উঠল, ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল তার শরীর। বলল, এই মরেছে! তোমার খালি

পাগলামি! যাও বাপু, আমি তাড়াতাড়ি কলে ছুটি, সায়েব সর্দার দুটোকে আবার ভুজুং ভাজুং দিয়ে টাইমে নামটা লেখাতে হবে।

কালো বলল, নতুন রাঁধিয়ে এসেছে, তার চোখ ফাঁকি দিয়ে কি আর খাবার আনতে পারব?

না পার, রেখে দেবে।

উপোস থাকবি! কালো বলল।—এসব ছাড় না কেন?

ফুলকি আবার হেসে উঠল, তোমার খালি এক কথা।

আর না শুনে গোবিন্দ তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। তার সারা মুখে ব্যথা ও হাসির বিচিত্র খেলা। কালো না কাল মরতে চেয়েছিল? সে কি এই মরণ! কালোর সেই বুক থেকেই কি ওই আবেগের থর থর ধ্বনি হাহাকার করে উঠেছে যে বুক পুড়ে পুড়ে তার ছাই হয়ে গেছে!

এই কালোই না পোড়া মাছের খাবি খাওয়া দেখে উপহাস করেছে মানুষের বাঁচার তাগিদকে! হায়! দু দু-বারের দাগা খাওয়া প্রাণে তার আবার পোড়ানি। না, এ সংসারে মানুষের পোড়ানির শেষ নেই। পোড়া সংসার যে!

গতকাল রাত্রের সেই গুরুগম্ভীর বেসুরো গলায় আবার শোনা গেল—

মন আমার নির্বাণ নগরে যদি যাবে।—

একটা মাথা-চাঁছা রোগা টিং টিঙে ছেলে বসেছিল একটা ঘরের সামনে আকাশের দিকে চেয়ে। শরীরটাতে তার কিছু নেই। মনে হচ্ছিল বসে বসে বুঝি ঢুলছে। কিন্তু সেই গুরুগম্ভীর গলায় গান শুনেই ছেলেটা ভেংচে উঠল অনুকরণ করে—মন আমার নির্বাণ নগরে যদি যাবে।······

সেই গুরুগম্ভীর গলায় আবার শোনা গেল,

এক স্বপ্নের অলংকার, গঠন বিবিধাকার······

পুনবারে গেলে দেখ যেই স্বপ্নো সেই হবে······

ছেলেটা তার ওই রোগা দেহ থেকে অস্বাভাবিক জোরে চিলের মত শব্দ করে মুখ বেঁকিয়ে উচ্চারণ করে ভেংচাতে লাগল। তাতে সেই গান থেমে গেল না।

ছেলেটার মা এক মধ্যবয়সী মেয়েমানুষ, আরও দুটো বাচ্চাকে নিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে।…এখানে এ খোলার চালায় অন্ধযুগের আদিম মায়ের মত মেয়েমানুষটির পোশাকের কোন বালাই নেই। একটিমাত্র নেংটি পরনে, বাদবাকি সমস্তটাই খোলা। তার নড়ার তালে তালে নত বুক দুলছে কিন্তু কোন অস্বস্তি নেই। লজ্জার কথা ভাবাই দুষ্কর। রোগা নয়, কিন্তু শরীরটা যে ফোঁপরা, তা তার ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছ। মানুষের গলায় মাদুলি থাকে। তার জট বাঁধা চুলে সেই মান্ধাতা আমলের বাঁধা বেণীতে একটা তামার মাদুলি ঝুলছে। মুখখানি নিতান্ত ভালো মানুষের মত সরল, চোখ দুটো যেন আলগা করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অত্যন্ত করুণ আর মিষ্টি গলায় সে তার ছেলেকে বলল, থাম্ বাবা চেঁচাসনি অমন। নাড়ি ছিঁড়ে যাবে যে!

সে কথায় ছেলেটা যেন আরও দুর্বার হয়ে উঠল। হ্যাঁ চেঁচাব। বলে সে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল। তার রুগ্ন মুখটা রক্তহীন শিরায় ছেয়ে গেল। মনে হল গলার শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবে এক্ষুনি।

মা অন্য দুটোকে রেখে রোগাটাকে বুকের কাছে নিয়ে আরও নরম, আরও অসহায় স্নেহকরা চোখে বলল, চেঁচালে যে মরে যাবি? শরীলে কী বা আছে তোর?

না থাক। বলে ছেলেটা ধাক্কা দিয়ে থামচে, লাথি দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল আর বলতে লাগল, গায় কেন ও শালা, কেন গায়? আমার ভালো লাগে না বলেছি।……

মা তার সেই মারগুলো অবিকৃত শান্তভাবেই গ্রহণ করে বুকের আরও কাছে টেনে নিয়ে বলল, থাক, ওর খুশি হয়েছে তাই। তোর ভালো না লাগলে ওর কি আসে যায়।

তারপর তার সেই একঘেয়ে তরঙ্গহীন গলার স্বরে বলল, তুই না বড় হয়ে কী করবি বলছিলি ?

সে কথায় ছেলেটা হঠাৎ রাগ ভুলে মুখভরা হাসি নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠল। বলল, মাকি সায়েবের সঙ্গে বিলেতে যাব।

তারপর ?

খুব বড় মিস্তিরি হয়ে ফিরে আসব। স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় যেন বলল ছেলেটা।

মা বলল, আর ?

বিচিত্র লজ্জায় মার খোলা বুকে মুখ ঢেকে আধো জড়ানো গলায় বলল, মেমসায়েব বিয়ে করব।

গাইগোরুর দাঁত বেরুলেও তার যেমন কোন ভাব বোঝা যায় না, মায়ের হাসিটিও প্রায় তাই। বলল, আর আমরা। তোর ভাই বোনেরা ?

ওরাও থাকবে আমার কাছে।

তাতে তোর মেমসায়েব যদি রাগ করে ?

তাহলে ঠ্যাঙাব খুব পড়ে পড়ে।

সে ভবিষ্যতের কথা ভেবে মায়ের আনন্দ হল কি দুঃখ হল বোঝা গেল না। কেবল দেখা গেল ছেলেটাকে সে বুকের কাছে নিয়ে দোলা দিচ্ছে। ছেলেটার চোখ বুজে আসছে আস্তে আস্তে।

আসলে এই বোধ হয় মায়ের কৌশল রুগ্ন ক্ষ্যাপা ছেলেকে শান্ত করার। কিন্তু এখানকার সমস্ত কিছু হঠাৎ যেন গোবিন্দের প্রাণের মধ্যে অত্যন্ত ভারী হয়ে চেপে আসে। অস্বস্তিতে যেন ছটফট করে তার

সর্বাঙ্গ। সমস্ত দুঃখ দৈন্য অনাহার নিয়েও খোলা আকাশ, পথের পর পথ, দিগন্তবিসারী মাঠ তাকে ডাক দেয়। সংসারের, ঘর-বেষ্টনীর বেড়াজালের বাইরে সেই নিঃসঙ্গ মুক্ত বাউলের ডাক এ পরিবেশকে যেন আরও যন্ত্রণাদায়ক করে তোলে। চব্বিশটা ঘণ্টা না কাটতেই পালাই পালাই করে ওঠে তার মন।

কিন্তু কালোকে বেরিয়ে আসতে দেখেই মনটা আবার তার থিতিয়ে যায়, মনে পড়ে যায় কালকের দুর্যোগময়ী সন্ধ্যার কথা। বাড়ি-ওয়ালার আহ্বান, সমস্ত মানুষগুলোর সরলভাবে হাসি দিয়ে তাকে গ্রহণ।

নরক বটে! কিন্তু এ জগতে কাজের বিনিময়েই না কজনা ডাকে দু-মুঠো পেটে দেওয়ার জন্য, অন্ধ কুঠরির আশ্রয়ের জন্য।

কালোর মুখের দিকে দেখল সে। সে মুখ মেঘলাভাঙা রোদের মত আলোছায়ায় ভরা। বোধকরি সেই আলোছায়ার মধ্যেই একটি বিবাগী হাসির রেখা লেগে রয়েছে তার ঠোঁটের কোণে।

এসেই বলল গোবিন্দকে, বাঃ একেবারে নির্জলা ফোরটুয়েন্টি করছ বসে বসে? রাঁধবে কখন? বাঁক আর টিন নিয়ে কল থেকে জল নিয়ে এস!

গোবিন্দ এক মুহূর্ত কালোর মুখের দিকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

ঠিক এসময়েই ফুলকি পেছন থেকে বলে উঠল, এই বুঝি সেই ফোরটুয়েন্টি?

গোবিন্দ ফিরে তাকাল। প্রায় তেমনি অগোছাল ফুলকি, উড়ু উড় চুল, রাত্রির নেশার ছাপভরা মুখ। ঠোঁটের কোণের হাসিতে যেন বিদ্রূপের আভাস। সে দাঁড়িয়েছে বেঁকে, বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে। কাপড় পরার ধরনটা তার ছত্রিশগড়ি আঁটসাঁট ও চড়াই উৎরাইয়ের মত।

কালো বলল, হাঁ, এই ফোরটুয়েন্টিবাজ, ভারী রসিক, জানলি?
গোবিন্দ একটু হেসে উঠল।
ফুলকি বলল, তা বাড়িওয়ালার দেখছি পছন্দ আছে। তবে—
কপালের টিপ ঝিলিক দিয়ে বলল, হাসিটা আর চোখ দুটো কিন্তু সুবিধের নয় বাপু, সাবধান। ও কোন্ অওরতকে কখন ফোরটুয়েন্টি করে দেবে কিছু ঠিক নেই।
বলে দুরন্ত বেগে খিলখিল করে হেসে উঠল।
কালো হেসে উঠল তার সামনের দুটি দাঁতহীন ফাঁক দিয়ে।
গোবিন্দ তেমনি হেসে বলল, যাকেই করি, তোমাকে তো পারব না!
ও মা গো! ঢলে পড়ল ফুলকি হাসিতে, এ যে খুব কথা বলে গো! তা আমি যে প্রেমযোগিনী······কখন মরব কে জানে।
বলে সে একবার চকিতে কালোর মুখের দিকে দেখে নিল। কালো যেন অর্থহীনভাবে হ্যা হ্যা করে হাসছে।
গোবিন্দ পেছোয় না। বলল, তা তোমাকে মারার ক্ষ্যামতা নেই বাপু আমার।
বুঝে গেছ? বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ফুলকি। সে হাসিতে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের আভাস যেন।
গোবিন্দ তাকিয়ে দেখল পাশে কালো নেই। কোথায় গেল? রান্নাঘরে ঢুকে দেখল একটা অন্ধকার কোণে কুলোর মধ্যে চাল নিয়ে কালো কাঁকর বাছার জন্য তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিড়বিড় করছে, শালা মরে গেছি।···
কি কথা যেন গোবিন্দের মুখের কাছে এসেও ফিরে গেল। সে বাঁক আর টিন নিয়ে গেল বেরিয়ে।

তারপর ঘণ্টা কয়েক বাদে বস্তিটা আবার জমে ওঠার চেষ্টা করে।

সবাই ঝটপট আসে, খায়, খেয়ে চলে যায়। যত তাড়াতাড়ি আসে, তত তাড়াতাড়ি খায়। ছোটে তার চেয়েও তাড়াতাড়ি।

কোন কোন ঘরে হঠাৎ মারামারি লেগে যায়। সেখানে রান্না হয়নি, ক্লান্ত ক্ষুধিত পেটে দেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু পেট আর মেজাজ তা মানবে কেন। শুরু হয়ে যায় মারপিট বউ বাচ্চাগুলোর উপরেই। ফলে শুরু হয় কান্না, গালাগালি। ঠিক এসময়েই হয়তো ওঠে সেই বুড়োটে গুরুগম্ভীর গলার গান।

হাঁক পড়ে বাড়িওয়ালার বাজখাই গলার, আবির্ভাব হয় তার বিরাট লোমশ বপুর।

তারপর সারা দুপুরটা যেন বস্তিটা ঝিম্ মেরে পড়ে থাকে। বেকার মেয়েরা ও ছোট বাচ্চারা থাকে ঘাটে মাঠে গোবর কয়লা কাঠের সন্ধানে। সমস্ত বস্তিটা থেকে যেন ভাপ উঠতে থাকে, ভ্যাপ্সা দুর্গন্ধ একটা এসময়েই যেন ফাঁক পেয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পাশের সুদৃশ্য বাড়িটার নরনারীদের কথাবার্তার দু-চারটে হালকা টুকরো ভেসে আসে নিরালা পেয়ে, নয়তো রেডিওযন্ত্র বা কণ্ঠ সংগীতের রেশ ভেসে আসে, যেন কোন্ সুদূর অমরাপুরী থেকে সুরের মায়া ঢেউ দিয়ে যায় মর্ত্যের এ অন্ধ পাতালে।

আর অন্যান্য সময় ঝামেলায় হট্টগোলে যেটা নজর করা যায় না, সেটা এখন দেখা যায় যে, ওই বাড়িটার দোতলা জানলা থেকে সব সময়েই কিছু না কিছু খোলার চালটায় পড়ছে। থুতু, মেয়েদের আঁচড়ানো চুলের ঝরা গুচ্ছ, কাগজের টুকরো, পরিত্যক্ত ন্যাকড়ার ফালি, এক ঝলক জল। যেন খোলার চালাটা একটা আস্তাকুঁড়। আর বাড়ির পেছনের জানলা দিয়ে কিছু ফেলতে গেলে ওখানে এসে সব পড়বেই।

গোবিন্দের নজরে পড়ল, সেই সকাল থেকে একটা ঘর একইভাবে দরজা খোলা পড়ে আছে কোণের দিকে। দরজাটার সামনে দুটো এ্যালুমিনিয়ামের বাসন পড়ে আছে এঁটোর শুকনো দাগ নিয়ে। কেউ সারা দিন সেদিকে একবার তাকিয়েও দেখেনি। বোধ হয় ঘরটায় মানুষ নেই। কোন সাড়া শব্দও পাওয়া যায় না।

সে আস্তে আস্তে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলতেই ধ্বক্ করে উঠল তার বুকটার মধ্যে। আড়ষ্ট কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। বুঝি দম নেই তার, বুকের ধুকধুকিটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। অসাড় !

সে ভয়বিস্মিত চোখে দেখল, বাঁশের খাটিয়ার ময়লা স্যাঁতসেঁতে কাঁথার উপর কঙ্কাল শোয়ানো রয়েছে একটা ! একটা কাপড়ে গলা থেকে পা অবধি তার ঢাকা। সেই কঙ্কালের কপালের নীচে আছে শুধু এক জোড়া অসহ্য ঝক্‌ঝকে বড় বড় চোখ, মণি দুটো যেন আগুন ধরানো মানিক। সমস্ত খাটিয়ার নোংরা বিছানাটার মধ্যে ওই চোখজোড়া ছাড়া আর কিছু নেই।

দরজা খোলা ও মানুষের সাড়া পেয়ে সে চোখ যেন অভিশাপে জ্বলে উঠল তীব্রভাবে পাতালের অন্ধ শান্তি ভাঙার জন্য। একবার বোধ করি নড়েও উঠল সেই কঙ্কালমূর্তি, একবার কেঁপে উঠল বা তার নাকে পরানো রূপোবাঁধানো কাঁচের নাকছাবি।

এমনি একটু সময় তাকিয়ে থাকার পর অন্ধকারটা থিতিয়ে এল, তখন গোবিন্দ চমকে উঠে আরও দেখল, একটা পাথরে কোঁদা কালো মূর্তি ড্যাবা ড্যাবা চোখে যেন ভূতের মত ঘাপটি মেরে বসে আছে ঘরের কোণে। খালি গা, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি মুখ ভর্তি।

গোবিন্দের মনে হল যেন যমের দোসর চুপে চুপে এসেছে আত্মাহরণ করতে। কি করবে সে হঠাৎ ভেবে পেল না। চলে যেতেও পারল না, জিজ্ঞেস করতেও পারল না কিছু।

ওখানে কী দেখছ কোরটুয়েঁ ট? বলতে বলতে কালো এসে পড়ল সেখানে।
গোবিন্দ যেন ধড়ে প্রাণ পেল। কালোও একবার সে দৃশ্য দেখে আপন মনে মাথা নাড়ল। বলল, ও আমাদের লড়াকু গণেশ আর ওইটে ওর বউ, ব্যামো হয়েছে। ওরা দুটোয় একদিন এ বস্তি মাথায় করে রাখত। বলে সে এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, গণেশ, কতদিন তুই এভাবে পড়ে থাকবি?
অন্ধকারের মূর্তি সে কথার কোন জবাব দিল না। চোখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ সেখান থেকে উঠে খাটিয়ার পাশে এসে একটু দাঁড়াল। তারপর ঝুঁকে পড়ে গোবিন্দ ও কালোর দিকে ফেরানো বউয়ের মুখটা ঘুরিয়ে দিল আস্তে আস্তে অন্যদিকে। পিঠের তলে চাপা পড়া চুলের গোছা আলতো করে সরিয়ে শিয়রের দিকে এনে ছড়িয়ে দিল। তারপর যেন সেই কতদূর থেকে ডাকল ধীরে ধীরে, দুলারী, দুলারী বউ।.........
কঙ্কাল মেয়ের সেই চোখের পাতা যেন আরও খানিক খুলে গেল আর সে দৃষ্টি হয়ে উঠল যেন এক প্রেমবতীর অনুরাগভরা। একটু বুঝি বা নড়ল তার ঠোঁট। নিরালংকার হাত একটু তোলার চেষ্টা করল, পারল না।
গনেশ তাড়াতাড়ি সেখানে বসে পড়ে কাঠি কাঠি হাত দুটো তুলে নিল। মুখের কাছে গিয়ে দুলারীকে জিজ্ঞেস করল, দরদ হচ্ছে? দে একটু হাত বুলিয়ে দিই।
তারপর হাতটার দিকে তাকিয়ে বলল, ভেঙে না যায়!
কালো তার স্বভাবগত থমথমা ভাব থেকেই হঠাৎ বলে উঠল, শালা নিজেই মেরে ফেলেছে বউটাকে, তা বুঝবে না, বুঝবে না।
গোবিন্দ নিঃশব্দে তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। কালো সেই

চাউনির জবাবেই বলল, তা নয়তো কি ? ও কামে যাবে না বউ ছেড়ে, কামাই করবে তো কি হবে ? কোথায় ডাক্তার কোথায় দাওয়াই ? বলে, কি করে ছেড়ে যাই, কখন মরে পড়ে থাকবে। আমি সামনে বসে থেকে ওর মরণ দেখব। বেতমিজ !

বলতে বলতে কালোর গলাটা অস্বাভাবিক মোটা আর ধীর হয়ে এল, অথচ ওর কামাইয়ের পয়সা এ বস্তির সবই হাত পেতে নিয়েছে তাদের দুঃখ ধান্দায়। ওদের দুটো প্রাণ ছিল, হ্যাঁ ! কিন্তু বউটা ব্যামোয় পড়ল আর ডাক্তারও শালা তেমনি এত এত টাকা চায় খালি। বলে, আজ দশ, কাল বিশ, কী ব্যামো রে বাবা। এত এত টাকার দরকার, আর তার মধ্যে ও ক-দিন ধরে কলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এত নিরাশ এত উদাস·········

আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল কালো, রুদ্ধশ্বাস গলায় বলল, হ্যাঁ তেরো দিন হাজত খেটেছে এই আমাদের জন্ম। আধপেটা রেশনের খিদায় হরতাল হয়েছিল তখন এই গনেশ ফটিচার ম্যানেজারের গলা ধরে কারখানা থেকে বার করে দিয়েছিল। হ্যাঁ···আর ওর বউ তেরো দিন বসে ছিল হাজতের দরজায়, উপোস করে, এত মহব্বত ওদের······এত মহব্বত।

হারিয়ে গেল কালোর গলার স্বর এবং এদের সেই গভীর মহব্বতের কথা বলতে গিয়ে বোধ হয় তার বুকের ক্ষতটা খোঁচা খেয়ে দগদগে হয়ে উঠল। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে এত কথা, সে একবারও মুখ তুলল না। গোবিন্দ কেবলি ভাবল, এ কী সর্বনেশে, কর্মনাশা সব-ভণ্ডুল-করা ভালবাসা ! বিশেষ তার প্রাণটা মস্ত বড় বলেই !······গনেশ আর দুলারীর দিকে তাকাতে গিয়ে তার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠল সেই ছুতোর বউয়ের ছবি, সেই কঙ্কালসার মায়ের উঠোনভরা দাপাদাপি।

ইস্! এ কী হতভাগা জায়গায় এসে পড়েছে সে। যেখানে সমস্ত কিছুই প্রাণান্তকর, কালোর সেই উপহাসের মতই মৃত্যুগামী, অবসাদ-গ্রস্ত নিরাশার জঞ্জালে ভরা! যেখানে আছে শুধু রোগ শোক পীড়ন আর তাকে এড়াতে গিয়ে ক্ষণিকের লালসা চরিতার্থতা, মুহূর্তের স্ফূর্তি। যেখানে কেবলি জীবনের ফেলে আসা গ্লানির ছবি বারবার সামনে এসে দাঁড়ায় সেখান থেকে পথে পথে নিঃসঙ্গ জীবনই ভালো নয় কি। করাত হাতে পথে পথে 'ছুতোর মিস্তিরি চাই' বলে শ্রমের কথা হেঁকে হেঁকে দেশ হতে দেশান্তরে যাব। গাঁয়ের মারী ব্যামো গাঁয়ে থাকবে, ঘরের শোক মুখ দিয়ে পড়ে থাকবে ঘরে, ভালবাসা বাসা বেঁধে থাকবে হৃদয়ে ছাড়াছাড়ির পোড়ানির জন্য। আকাশ ফুঁড়ে বৃষ্টি আসবে, শুকোবে আবার, ঝড় আসবে সেও যাবে।......থাকবে শুধু পথ। আমি সব পেছনে ফেলে চলে যাব দিক হতে দিগন্তে মুক্ত পাখীর মত। মরণও যেদিন আসবে, আসবে মৃত্যুদূত একাকী হঠাৎ পথের উপর, তার কাছে প্রাণ সঁপে দিয়ে বলব, চল। আর কিছুই চাইনি, তোমার জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম। আজ এসেছ। কী ভাগ্যি, দশজনের সামনে আমার এ পোড়া প্রাণ হারাতে হয়নি। আমি সে ভিড় চাইনি।

পেছনে তাকিয়ে দেখল বাড়িওয়ালা এসে দাঁড়িয়েছে। তার ঘন গোঁফ ও খোঁচা দাড়িভরা মুখটা দলা পাকিয়ে উঠেছে কুঁচকে। চোখ নেই, আছে একজোড়া মোটা মোটা লোমশ ভ্রূ। ফোলানো নাকের পাটার পাশে গভীর কোঁচ দুটিতে তার ব্যথা না রাগ কিছু বোঝবার যো নেই। সে আপন মনে বলতে লাগল, কোন দোষ নেই আমার, আমি কী করব। কলে যাবে না, কামানো বন্ধ করল। আমি কী করব।

তারপর আশেপাশে কেউ নেই দেখে বলল, হাসপাতালের মত পাকা বাড়ি হলে এরকম ব্যামো হত না। বস্তি কিনা!......কিন্তু ওকে এবার আমি মেরে কাজে পাঠাব, ঠিক দেখে নিও।

কিন্তু গণেশ মুখ তুলল না দুলারীর উপর থেকে। দুলারীর রুগ্ন হৃদয়ের বেদনায় লয় হয়ে গিয়ে সে হাত বুলোচ্ছে। বুঝি না সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে, না মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে অতন্দ্র প্রহরীর মত।

সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে একসময় অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল গোবিন্দ। যেন দুলারীর ব্যামো এসে গ্রাস করতে চাইছে তাকে, নোংরা দুর্গন্ধ কাঁথা কাপড়গুলো জড়িয়ে ধরছে তাকে। ছুতোর বউ যেন শুয়ে শুয়ে দাপাচ্ছে খাটিয়াটার উপর, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে তার সামনে। এমনি করেই মরবে ছুতোরের বউয়ের মত বউয়েরা।

সামনে এগুতে গিয়ে সে যেন চকিতে কিসের এক সংকোচে থেমে গেল। পরমুহূর্তে সে হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে শক্ত হাতে গণেশকে টেনে দাঁড় করাল। তারপর স্থির চোখে কঠিন গলায় বলল, সরে দাঁড়াও, সরো।

গণেশ যেন আচমকা ভ্যাবাচাকা খেয়ে উঠে দাঁড়াল এবং অর্থহীন বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল গোবিন্দের দিকে।

কিন্তু মৃতপ্রায় দুলারীর চোখে যেন ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করে আগুন জ্বলে উঠল। আশ্চর্য! এখনও এত আগুন আছে তার চোখে! যেন ফণিনীর মাথার মণি কেউ কেড়ে নিয়েছে।

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি গণেশের জায়গাটিতে বসে আকুল গভীর ধীর গলায় বলল দুলারীর দিকে চেয়ে, গণেশ অনেক বড়, কিন্তু তুমি যে ওর কাছে তার চেয়েও বড়। তুমি মরে গণেশকে মারবে? না, তুমি বাঁচো, গণেশকে কাজে যেতে বল।

দুলারীর অপলক জ্বলন্ত চোখ যেন আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে এল, খানিকটা সংশয় ও বিস্ময়ের ছায়া এসে পড়ল সেই চোখে। খানিকক্ষণ এমনি তাকিয়ে থাকতে থাকতে কয়েকবার চোখের পাতা কেঁপে উঠে তা বন্ধ হয়ে গেল। দু-ফোঁটা জল চক্‌ চক্‌ করে উঠল চোখের কোণে। তার কানে লেগে রইল, বাঁচো বাঁচো গণেশের বউ।

গোবিন্দ একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে গণেশকে বলল, আর কাঁথাটাথা আছে ?

গণেশ ঘাড় নেড়ে জানাল আছে।

গোবিন্দ বলল, বার কর।

গণেশ যেন যাদুকরের মন্ত্রদণ্ডের নির্দেশচালিতের মত একটা চটের বোঁচকা খুলে একখানা নক্‌সী কাঁথা বের করল। কাঁথাটির চারপাশে লাল সুতো দিয়ে গোলাপ কুঁড়ির বেড়া। মাঝখানে নীল সুতোয় ঘন ঘন ফোঁড়ের মধ্যে মস্ত একটি পদ্মফুল। গণেশ হয়তো তার দুলারী বউয়ের এ স্মৃতি রেখে দিতে চেয়েছিল।

গোবিন্দ তার হাত থেকে কাঁথাখানি নিয়ে বলল, বউকে কোলে কর, আস্তে করে তোল।

গণেশ মুহূর্ত দ্বিধা করে স্থির রইল, তারপর দু-হাতে ভালো করে সাপ্‌টে তুলে নিল দুলারীকে বুকের মধ্যে।

কালো এবং বাড়িওয়ালা স্তব্ধ বিস্ময়ে এ দৃশ্য দেখছিল। তাদের বাক্য রহিত হয়ে গেছে একেবারে। গোবিন্দ দুলারীর পরিত্যক্ত বিছানা ধরে টান দিল। ইস্! বিছানা শুধু স্যাঁতসেঁতে নয়, খানে খানে ভেজা এবং ময়লা গন্ধ ও দাগ রয়েছে। কিন্তু সে থামল না। সে বিছানা তুলে ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। খাটিয়াটা থেকে যেন রোগের ভাপ বেরুচ্ছে। তারপর সে খাটিয়াটা ঘরের বাইরে নিয়ে এসে রাখল খোলার ছাউনির ছায়ায়, বারকয়েক জোরে জোরে মাটিতে ঠুকে ঝেড়ে নিল। তারপর সেই কাঁথাখানি দিল পেতে।

পেতে দিয়ে বলল গণেশকে—দেও, শুইয়ে দেও।

গণেশের এক মুহূর্ত দ্বিধার ফাঁকে কালো জিজ্ঞাসা করল, বাইরে ?

হ্যাঁ, এই আকাশের তলায়, এই রোদে হাওয়ায়, দরকার হলে মাঠের ধারে রেখে আসব ওকে সারা দিন। দৃঢ় গভীর গম্ভীর গলায়, শান্ত

অথচ আবেগের সুরে বলল গোবিন্দ, রোগ তো ওই নোংরা বিছানায়। ওই ঘরে, ঘরের ওই অন্ধকারে। রোগ তো ভাঙা টুণ্ডা বুকে, মরণ যেখানে সব শেষের ভরসা নিয়ে বসে আছে। গণেশের বউ যদি বাঁচে, তো বাঁচবে বাইরেই। যদি বাঁচে, তো বাঁচবে গণেশের বাঁচার সাধের জন্য।
গণেশ আস্তে করে শুইয়ে দিল দুলারীকে সেই বিছানায়। প্রথম আলোর পলকটা সইল না তার চোখে। কয়েকবার পিটপিট করে চোখ বুজে রইল সে। আলোতে তার কঙ্কালসার শরীরের বর্ণ বদলে গেছে। ভাবলেশহীন মুখে তার ভাবের সঞ্চার হয়েছে যেন, সুশীতল আরামের একটা উদার ছাপ পড়েছে যেন তার মুখে।
গণেশ দুলারীর চোখের জলটুকু মুছিয়ে দিল।
গোবিন্দের বারবার মনে হল, সকালে আজ ফুলকির পায়ের কাছে বসে কালো যে মরণ চেয়েছিল, সেই মরণের নেশায় বুঁদ হয়ে দুলারী তাড়াতাড়ি মরতে চেয়ে মুক্তি দিতে চেয়েছিল গণেশকে। কিন্তু সে কি মুক্তি?
হ্যাঁ, মুক্তি সে পথের, দূর-দূরান্তরের, সবছাড়ার, সব হারানোর।......
তবু হাঁয়রে মানুষের মন! যে আকাশটুকু না হলে তোর বাঁচন নেই, সেই আকাশের তলায় তুই আবার গড়িস্ ঘর, বেঁচে থাকিস্ রোগ বালাই নিয়ে, ঝড়ে বন্যার দাঁড়াস বুক দিয়ে, নাড়ি-ছেঁড়া তোর রক্ত বীজের ধন দিয়ে করিস সোহাগ। পৃথিবী ছাড়ালে কি ছাড়িয়ে যাওয়া যায় মানুষকে। আর পৃথিবী জুড়ে আছে পথ, কিন্তু তার ধারে ধারে আছে কোটি ঘর।
ভাবতে ভাবতে বুকটা বড় টনটন করে উঠল গোবিন্দের। গণেশকে বলল নোংরা বিছানাগুলো দেখিয়ে, যাও, ধুয়ে নিয়ে এস এগুলো। গোমড়া মুখে একটু হাসো, হাসো, আমার মুখের দিকে দেখলে আর কি হবে। জান অত সস্তা নয়, বুঝেছ।

তারপর স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হেসে বলল, জানো কালো, মরব তো সবাই, এ ব্যাটা আগেই ফাঁকি দিয়ে মরতে চায়। তা কি হয় চাঁদ! হা হা হা! মনে মনে বলল, পথ, যদি সময় আসে তোমার কাছে যাব। কিন্তু ছুতোর বউ, তুই বাঁচিস দুলারী হয়ে, প্রাণ ভরিস দশজনার গণেশের, নইলে ছাড়ান নেই আমার।

গনেশ খানিকটা অবাক নির্বোধের মত বিছানাগুলো নিয়ে চলে গেল। কিন্তু গোবিন্দের হাসিতে কেউ যোগ দিতে পারল না। তারা তেমনি তাকিয়ে রইল গোবিন্দের দিকে।

গোবিন্দ এক মুহূর্ত সবাইকে দেখে সেখান থেকে চলে গেল।

বাড়িওয়ালা তেমনি হতবাক হয়ে মুখ ঘুরিয়ে তার চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ বাড়িওয়ালা বলে উঠল এ যদি ফোরটুয়েণ্টি না হয় তো, আর কি হতে পারে আমি জানি না।

কালো বলল, শালা পাগলও হতে পারে।

কেবল নির্বাক দুলারী অপলক চোখে তাকিয়ে রইল শূন্যে।

দু-দিন কেটে গেল।

সন্ধ্যা ঘনায়।

গোবিন্দ কয়লা ভাঙছে।

সারা বস্তিতে কোলাহল শুরু হয়েছে। বাইরের মানুষেরা ঘরে ফিরেছে সব। তাদের কথাবার্তা, গান গল্প ঝগড়া বিবাদের শেষ নেই। অভাব নেই প্রসঙ্গের। এর মধ্যে আছে মাতালের নেশামত্ত ধ্বনি, দুনিয়াকে থোড়াই কেয়ার করার বুক-ঠোকা বাহাদুরি কিংবা ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ কোন দুঃখের কথা মনে করে সুর করে

শুরু হয় ফুঁপিয়ে কান্না। কেউ কেউ তৈরি পোশাক বাগিয়ে শরিফ মেজাজে বেরিয়ে পড়ে, কারো কারো থাকে 'অভিসারের' তাড়া।

এর মধ্যেই চলেছে দিল-ছিপছুপ মহব্বতের রঙ্গ খেলা, ইশারার গান দু-এক কলি। যারা একই কারখানায় অনেকে কাজ করে তাদের বসেছে মজলিশ। কোন্ সাহেব ভালো আর মন্দ সে কথায় আছে বহু পরস্পরবিরোধী যুক্তিতর্ক, কোন্ সর্দার কার কাছে কত টাকা খেয়েছে, কোন্ কেরানীবাবু কতটা ভাগ বসিয়েছে তাতে, ইত্যাদি থেকে শুরু করে এ দফার পাট ভালো না মন্দ, ঘড়িকলটা কি করে বিগড়েছে, ছাঁটাই, নয়া মেশিন, খারাপ অওরত এবং ওয়ার্কস্ কমিটির মাথায় হাত বুলোনো চাল পর্যন্ত। কোন কিছু বাদ নেই। এমন কি সাহেবদের কে কতটা মাতাল হয় ও ঘড়ি ঘড়ি সিগারেট ফোঁকে, কে একটু মজাদার ও মেয়ে মজুরের সঙ্গে জমাবার চেষ্টা করেছে এবং মেমসাহেবরা কে কার স্বামীকে ফেলে দোসরা সাহেবের সঙ্গে ফুর্তি করতে গিয়েছিল, ফলে কোঠিতে লেগেছিল মারামারি সাহেবদের মধ্যে—সে সব আলোচনাও এর মধ্যে যুক্ত হচ্ছে।

বস্তির বাইরের রকে বসেছে বাড়িওয়ালার নিজস্ব মজলিশ। আসলে সেটা গাঁজার মজলিশ। সেখানে যার যা খুশি তাই বলে। বলে বেশী বাড়িওয়ালাই, সবাই তা শোনে। একটি বাঁধা আড্ডা। কিন্তু হট্টগোল নেই। আর যাদের একটু ঝামেলা কম, তারাই এসে বসে এখানে।

সেখানে খানিকক্ষণ উশখুশ করে কালো উঠে এল। অনেক দিনের অভ্যেসের জন্ত তার মনটা পড়েছিল রান্নাঘরের দিকে। তাছাড়া গোবিন্দের উপর তার মনটা কেমন পড়ে গিয়েছিল।

সে এসে দেখল গোবিন্দ উনুনে খুঁটেতে কেঁসোর আগুন ধরিয়ে কয়লা ছেড়ে দিচ্ছে। বেশ হাত চালিয়ে কাজ করছে গোবিন্দ। কয়লা ছেড়েই সে শিলনোড়া নিয়ে পড়ে।

বাঃ তুমি বেশ কাজের আছ তো? কালো হেসে হেসে বলল।

তা দেখ, এ শালার কাজে দু-এক ছিলিম না হলে জমে না। জুত্ হয় না।

তা ফোকটিয়া পেলে—গোবিন্দ আড়চোখে তাকিয়ে হাসল।

কালো চোখ ঘোঁচ করে বলল, হুঁ? না বলতেই……?

বলে সে উঠে চলে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এল বেশ দুরন্ত করে সাজানো হাতের চেটোয় ঘষা চকচকে কলকে নিয়ে। গোবিন্দের পাশে বসে বলল, নেও, টেনে নেও।

গোবিন্দ বলল, আরে আগে তুমি টানো।

না আগে তুমি।

তা কি হয়। তুমি একটা পাঁড় ওস্তাদ।

ও শালা যে টানে সে-ই মহাদেব হয়, ওস্তাদ বনে। নেও নেও।

উঁহুঁ, তুমি পেসাদ করে দেও।

শালা পাক্কা ফোরটুয়েণ্টি। বলে অগত্যা কালো গোটা কয়েক টান দিয়ে কল্কে তুলে দিল গোবিন্দের হাতে।

গোবিন্দের কলকে বাগিয়ে ধরার কায়দা দেখেই কালো ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর টানের কেরামতি দেখে বেশ উল্লসিত গলায় তারিফ করে উঠল গোবিন্দের পিঠে চাপড় মেরে. বাঃ বাহ্ রে ওস্তাদ, সবই জানো দেখ্ছি।

গোবিন্দ কোন কথা না বলে চোখ বুজে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কলকেটা তুলে দিল কালোর হাতে। কালো অবশিষ্টটুকু শেষ করে কলকে উপুড় করে দিল।

তারপর তারা দুজনেই কিছুক্ষণ ধোঁয়া তপ্ত রক্তচক্ষু নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ কালো বলে উঠল, তুই শালা পাগল আছিস্।

গোবিন্দও বলল, আমি যদি পাগল হই, তুই শালা ভবলপাগলা তা'লে।
কথা শেষে তারা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল। পরস্পরের মধ্যে তাদের অদ্ভুত জমে গেছে।

কালো বলল, আচ্ছা, তোর আর কে আছে বল্ তো, সত্যি বলবি।

গোবিন্দের গলাটা গাঁজার নেশায় পাল্‌টে গেছে। বলল, কেউ নেই।

মাইরি ?

মাইরি।······তবে এই তোমরা আছ।

বে সাদী কিছু—

হয়েছিল।

কী হল ?

কেটে পড়ল। বলে হাসতে গিয়ে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল গোবিন্দের। কালো ঠিক বোধ হয় বুঝতে পারল না লোকটা তাকে ফোরটুয়েন্টি করছে কি না।

গোবিন্দ নোড়া নিয়ে শিলের উপর উপুড় হতে গিয়ে হাত নেড়ে আবার বললে, আর আটকুড়ো নই, ছেলেমেয়েও হয়েছিল। সবশুদ্ধ গায়েব হয়ে গেছে। কালো বিশ্বাস করতে না পেরে গোবিন্দের মুখটা তুলে ধরল তার দিকে। গোবিন্দের লাল চোখ দুটো তখন যেন কোন্ দূরে পড়ে আছে, কি দেখছে।

কালো জিজ্ঞেস করল, কাটল কি রকম ?

খাবি খেয়ে খেয়ে, দাপিয়ে, ঠিক যেভাবে পোড়া মাছ মরে। বলতে বলতে গোবিন্দের গলাটা অত্যন্ত তীব্র আর চাপা হয়ে এল।

কালো গোবিন্দের মুখের কাছে মুখটা এনে তাকিয়ে রইল একটু, তারপর গোবিন্দের হাঁটুতে হাত রেখে যেন ঝিমিয়ে পড়ল, আর এক হাতে গোবিন্দের একটা হাত চেপে ধরল জোরে।

বাড়িওয়ালা কিছুক্ষণ আগেই এসেছিল কিন্তু এদের কথাবার্তা শুনে

দাঁড়িয়ে পড়েছিল দরজার আড়ালে। তারপর যখন দেখল ওরা পরস্পর ওইভাবে বসে রইল তখন প্রায় একটা হুংকার দিয়ে সে ঘরে ঢুকল।—হুঁ! বাঃ! সাজানো কল্‌কেটি এনে এখানে দুজনে বেড়ে জমে গেছ? আর আমি ওখানে গলা শুকিয়ে—

হাত ঝট্‌কা দিয়ে বলল কালো, তুমি বুঝবে না বাড়িওয়ালা, এসব আমাদের কথা।

বাড়িওয়ালাও তাদের পাশে বসে পড়ল এবং বিদ্রূপের স্বরে বলল, ওঃ দুনিয়ায় খালি তোদেরই ঘর সংসার ছিল, তোদেরই খালি সুখ দুঃখের কথা আছে, আর কোন মানুষের কিছু নেই।

না—তা বলছি না।

থাম্! ধমকে উঠল বাড়িওয়ালা। তারপর আপন মনে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে চাপা গলায় বলে উঠল, কী হবে, কী হবে সে প্যান-প্যানানি গেয়ে? কী দাম আছে? আশমান থেকেও এক ফোঁটা পানি পড়বে না। তবে? ওই তো গণেশ, দুঃখ নিয়ে পড়ে আছে।

গোবিন্দ বাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক বলেছ তুমি বাড়িওয়ালা, ওতে কিছু হয় না।

হ্যাঁ, এই তুমি বুঝবে। বলে সে গোবিন্দের আরও ঘন হয়ে এল। বলল, বল তো এই সংসারে দুঃখ কার নেই? কার শালা কোন্ বাসনাটা পুরেছে, কে কি চেয়ে পেয়েছে?

পায় না, ঠিক। গোবিন্দ বলল, আর পায় না বলেই জানো কেউ শালা পাগল হয়, আর কেউ শালা সব ছেড়ে পথ ধরে। কিন্তু যাবে কোথায়? আর পাগল হলেও তার রেহাই কোথায়? মানুষের আশা কখনো মরে?

বলতে বলতে গোবিন্দের চোখের উপর ভেসে উঠল দুলারীর কঙ্কাল মুখ। হ্যাঁ, আশা যদি মরবে তবে দুলারীর ওই মরণোন্মুখ মুখ দেখে তার

ছুতোর বউয়ের কথা মনে হয়েছিল কেন? আর কি বলে সে ছুতোর বউকে বাঁচতে বলল দুলারীর মধ্যে?

বাড়িওয়ালা সন্তর্পণে বলল, হ্যাঁ, মানুষের আশা কখনো মরে না। এই ধর সত্যি বলছি আমার টাকা খুব বেশী নেই, তবে জমিটা মৌরস করাতে পারছি না বলে—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে শামুকের মত চোখ দুটো ভ্রূর তলায় ঢেকে তাকাল গোবিন্দের দিকে। বলল, মুখ ফেরালে কেন তুমি? মুখ ফেরালে কেন?

গোবিন্দ বলল, তো কি করব। তোমার মাথা একটু খারাপ আছে।

আমার মাথা খারাপ, আর তোমাদের মাথা খুব সাফ? প্রায় মারতে উঠল বাড়িওয়ালা।

তা তোমার মত অত খারাপ নয়। তোমার যেন বাই। গোবিন্দও বলল খুব সন্তর্পণে।

চোপ্! আমি বল্ছি চোপ্! শালা ফোরটুয়েন্টি, তোমাকে আমি কালকেই তাড়াচ্ছি, দাঁড়াও। বলতে বলতে বাড়িওয়ালা উঠে পড়ল। বলল, কালো, এক কলকে সাজবি চল্।

বলে বেরিয়ে গেল।

কালো বলল, ক্ষেপিয়ে দিলি তো?

ও ক্ষেপেই আছে। বলে গোবিন্দ তাড়াতাড়ি উঠে জলন্ত উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। তারপর বসল বাটনা বাটতে। কালো বেরিয়ে গেল।

●

নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে লোটন বউয়ের। অপলক কিন্তু যেন

ঠাণ্ডা শিরশির চোখে সে দেখছে নন্দ আর হরিশের কাণ্ডটা। ঠোঁট টিপে আছে, তবু কিছু বলছে না।

এও বড় বিচিত্র যে, নন্দ-হরিশ কল থেকে এসে বসেছিল চুপচাপ, কিন্তু নিতান্ত অকারণেই যেন কি কারণে হঠাৎ তাদের ঝগড়া লেগে যায়।

কোন কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ নন্দই হয়তো একটা দমকা নিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে, নাঃ, একটা আলাদা ঘর দেখে চলে যেতে হবে।

হরিশও চুপ করে থাকতে পারে না। কথাটা গায়ে পেতে নিয়ে বিদ্রূপ করে বলে, খালি ফুটানি। যেতে তো দেখি না।

লোটন বউ হয়তো কোন কাজ করছিল। এদের কথা শুনেই তার দৈনিক অভিজ্ঞতা থেকে দূরাগত এ্যাসিড গন্ধ পাওয়া সাপের মত সচকিত হয়ে মুখ তোলে আর তার মোটা নাক উঠতে থাকে ফুলে ফুলে।

আর ওরা দুজন ভাই ভাই সুনিশ্চিত, তবু নন্দ বলে ওঠে, যাই না তো তোর বাপের কি ?

তবে বলিস্ কেন বান্‌চোৎ ?

আমার খুশি হয়েছে বলেছি।

তবে আমারও খুশি হয়েছে।

লোটন বউ নীরব।

শালা খুশি মানাচ্ছ। নন্দই এক ঘা প্রথম কষিয়ে দেয় হরিশকে। কেননা সে হরিশের চেয়ে বড়। তারপর শুরু হয়ে যায় রাম রাবণের লড়াই, গালাগাল চিৎকার। বস্তির আর সব গোলমালকে এ ব্যাপারটা ছাপিয়ে ওঠে বলেই, সকলের কান এবং নজরটা এদিকেই এসে পড়ে। যে যার নিজের ব্যাপার ভুলে এদিকেই এগিয়ে আসে।

বাড়িওয়ালাও এল। যমদূতের মত এসে ধরল দুটোকে।

গোবিন্দ রান্নাঘর থেকে সব শুনতে লাগল কিন্তু গেল না। প্রায়

কালকের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। সে মনে মনে বলল, তিনটের যে কোন একটা না মরলে এর ফয়সালা হবে না। কিন্তু যে নন্দ আর হরিশ পরস্পরের মধ্যে এত মারামারি করে, কালকে তারাই আবার একই সঙ্গে কেমন করে লোটন বউয়ের ডাক ছেড়ে কান্নায় সান্ত্বনা দিচ্ছিল। আর মার খেয়েই বা কেন তারা বিনা বিবাদে ঘাড় ভেঙে বসেছিল পহররাত অবধি ওই ঘরের দরজায়।

লোটন বউয়ের সেই ডাক ছেড়ে কান্না উঠল, ওরে আমার কেউ নেই রে। ছুটো কুত্তা আমাকে জালিয়ে খেল রে, আমাকে সকলে বে-ইজ্জত করছে গো!…

কে একজন [illegible]। বিরহার সুললিত টানা সুরে গেয়ে উঠল,

আরে লোটনোয়া তু কঁহা গেইলুহ
কসম তোহার আরে মুঝে লে চলহ্।

কে একজন অমনি সরু গলায় বলে উঠল, আরে কৌন্ জানে কঁহা পতা মিলে।

একটা হাসির রোল পড়ে যায়।

লোটন বউও শুরু করে, তোদের গানে আমি এই করি সেই করি।

নন্দ হরিশ করুণ চোখে সকলের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। দুজনেই এক পা এক পা করে গিয়ে লোটন বউয়ের দু-পাশে বসে।

গোবিন্দ বেরিয়ে এসে বলল বাড়িওয়ালাকে, এখনই তিনটেকে ঘরে ঢুকিয়ে দেও না, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সে[illegible]রা নিজেরাই যাবে।

তবে মারামারি করে কেন ওরা?

জিজ্ঞেস কর।

গোবিন্দ হরিশ-নন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, কেন কর?

অমনি লোটন বউ তাকে যেন খেতে এল, তোর কি রে, তোর কি তাতে ?

গোবিন্দকে চমকে উঠতে দেখে সবাই হেসে উঠল।

সবটাই যেন লোটন বউয়ের ব্যাপার, হরিশ-নন্দকেও কেউ কিছু বলতে পারবে না।

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি হকচকানিটা কাটিয়ে বলল, তুমি যে আমার ভউঝি লাগো।

জবাবে লোটন বউ আরও কঠিন কটূক্তি করে নন্দ-হরিশকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ধরাশায়ী করে ঘরে ঢুকে পড়ল। বন্ধ ঘরের ভিতর থেকেও তার বিলাপের সুর আসতে লাগল ভেসে।

কেবল নন্দ আর হরিশ সেই দরজাটাতে মুখ দিয়ে পড়ে রইল। কেন ? কী দাসখত ওরা লিখে দিয়েছে লোটন বউয়ের পায়ে। কিন্তু গোবিন্দের আবার মনে পড়ল, লোটন বউ হয়তো বাধ্য হয়েই থাকে, হয়তো পেটের জন্যই তাকে নন্দ-হরিশের ঘরে থাকতে হয়।

তবু নন্দ আর হরিশকে দেখে মায়া লাগে। যেন দুটো অভিশপ্ত জানোয়ার বহু লোকের সামনে চুপচাপ পড়ে আছে।

কালো এসে গোবিন্দের হাতে একটা টান দিয়ে বলল, তুই এসব বেতমিজদের ব্যাপারে কথা বলতে গেছিস্ ? চলে আয় দোস্ত্, এখানে কোন ফোরটুয়েন্টি চলবে না।

গোবিন্দ রান্নাঘরের দিকে চলে গেল কালোর সঙ্গে।

কালো আবার বলল, কুত্তা ঘেউ ঘেউ কেন করে, ষাঁড় কেন গোঁ ধরে, যাবত তোমার পিথিমীর অনেক কাণ্ডই অনেকে বোঝে, কিন্তু বেগড়ানো মেয়েমানুষকে বোঝে, তেমন সাধ্যি কারো নেই। অমন যে একটা যোয়ান পাট্টা ছিল লোটন, সেটাকেও দেখতাম

মাগীটার কাছে কেঁচোর মত পড়ে থাকত। বলি কেন? না, ওর প্রাণে বিষ আছে।

গোবিন্দের মুখটা যেন কি অসহায়তায় থম্ ধরে রইল।

সেই গুরুগম্ভীর বুড়োটে গলার গান উঠছে,

ওরে, অমর কেউ থাকবি না তো, মরতে হবে সবারে,

তবে সমসারে তোর এত ভেদ-জ্ঞান কিসের তরে।

সেই রুগ্ন ছেলেটা তখনো ঘুমায়নি কিংবা জেগে গেছে। গান তার কানে যেতেই ভেংচে উঠল সে তারস্বরে।

এমন সময়ে এল তার বাপ। হঠাৎ মনে হয় লোকটা মানুষ নয়, একটা পাঁশুটে রং-এর মন্থরগতি ক্রুদ্ধ মোষ বিশেষ। সে এসেই হেঁকে উঠল ছেলেটার প্রতি, এ্যাই, এ্যাই, শূয়োরের বাচ্চা, চুপ মার। নইলে—

নেশায় টলমল, জড়ানো গলা। একবার তার রক্তচক্ষু দিয়ে চেয়ে সামনে দেখল বউটা রয়েছে। বিনা বাক্য ব্যয়ে সে হঠাৎ বউটাকে ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করল। মত্ত বলে তার জায়গা অজায়গা বলেও খেয়াল রইল না।

মার খেলেও কি মানুষের মুখের কোন ভাবান্তর হয় না। গাইগোরুও মার খেলে তার চোখে একটা ভীতভাব ফুটে ওঠে, অসহায় উর্ধ্বশ্বাস গতিতে ছুটতে চায় সে কিন্তু এ মধ্যবয়সী মেয়ে মানুষটির সে বোধও নেই। সে বৃষ্টি আটকাবার মত ঘাড় পেতে, হাত তুলে খানিকক্ষণ সেই মার খেল। স্বামী মারতে মারতে যে সব কথাগুলি বলছিল, তার একবর্ণও বোঝা যাচ্ছে না। কেবল কতকগুলি গালাগাল খানিকটা স্পষ্ট। লোকটা হাঁপিয়ে উঠেছে মারতে মারতে।

বউটি তেমনি নরম এবং শান্ত গলায় বলল, হয়েছে, এবার থাম, চল ঘরে চল।

বলে সে তার স্বামীকে হাত ধরে ঘরের দিকে নিয়ে গেল। কিন্তু স্বামীর তখনো থামার নাম নেই। সে ওর মধ্যেই এক হাতে ধপাধপ পিটিয়ে চলেছে।

ঘরের রকে কেঁসোর আলো জ্বলছিল, তার এক টুকরো আলো অন্ধকার ঘরটার এক কোণে একটু পড়েছিল। ঘরের মধ্যে মত্ত স্বামী ধড়াস্ করে তার বৌকে নিয়ে মাটিতে পড়ল।

রকের উপর বসা রুগ্ন ছেলেটা অপলক জ্বলন্ত চোখে ঘরের অন্ধকার কোণটার দিকে তাকিয়েছিল। গলার শিরাগুলো তার ফুলে উঠেছে। জিরজিরে হাড়সার শরীরটা উঠেছে শক্ত হয়ে। বুকের বাঁ দিকটা টুক টুক করে নড়ছে।

সমস্ত পৃথিবীটাই এমনি দমবন্ধ করে রয়েছে কি না কে জানে। চটের কেঁসোর জ্বলন্ত শিখাটাও অকম্পিত স্থির।

কিছুক্ষণ পরে তার মা কোমরের নেকড়াটা গুছিয়ে বেরিয়ে এল, জটপরা মাথাটা খস্ খস্ করে চুলকোল একটু তারপর ক্ষ্যাপা ছেলেটাকে ধরে বুকের কাছে নিয়ে এল। তার জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, এস বাপ্, অত ক্ষেপছিস কেন? মরে যাবি যে!

সেই অন্ধকার কোণের দিকে তাকিয়েই ছেলে বলল, ও শালাকে আমি মেরে ফেলব।

ছি, ও যে তোর বাপ হয়।

হোক। ও তোকে মারে কেন?

আর কাকে মারবে বাবা? ওর আর বউ কোথায়, কে ওরটা খায় আর পরে? আর কার জন্য ও সারা দিন পড়ে পড়ে খাটে?

তা বলে মারবে?

মারবে। ইচ্ছে করলে খুনও করতে পারে। গাওনার সময় আমার বাপ ওকে যে দুটো বলদ দিয়েছিল, তার একটাকে ঠেঙিয়েই মেরে ফেলেছিল। আমার কানের রূপোর মাকড়ি দুটো একটা চামারনীকে দিয়ে দিয়েছিল। ইচ্ছে করলে আমাকেও মেরে ফেলতে পারে।

এত নির্বিকার, এত শান্ত, এত স্বরহীন গলাটা মায়ের যে, ছেলেটা ওই বুড়োর বেসুরো গানকে ভেংচানোর মত ভেংচে ওঠে মাকে। ধাক্কা দিয়ে খামচি কেটে সরিয়ে দিতে চায়। খিঁচিয়ে ওঠে, পারে সব পারে। তোরা দূর হ আমার কাছ থেকে, দূর হ।

মা আরও মিষ্টি করে ছেলেকে কাছে টেনে বলে, ওরই জন্য তো তোদের পেয়েছি বাপ, নইলে কোথায় পেতুম। তারপর একটু চুপ থেকে মা অন্য কথা বলে, কালকেই তো তুই বড় হবি।

যাদুমন্ত্রের মত ছেলেটার মুখভাব পরিবর্তন হয়, ক্যাপাটে ভাবটা কেটে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বলে, তুই তো রোজই তাই বলিস। হই না তো!

হবি বাবা হবি।

তবে কালকেই মাকি সায়েবের কাছে নিয়ে চল্।

আচ্ছা।

আর আমি বিলেত গিয়ে সায়েবদের কারখানায় কাজ শিখব, বিকেলে রোজ সায়েবদের কোঠির পেছনে গঙ্গার ধারে বসে থাকব। সেই অনেক দূর গঙ্গার নৌকাগুলিকে চেঁচিয়ে ডাকব।

সেখানে কি গঙ্গা আছে?

মায়ের এ প্রশ্নে সে নির্বিকারভাবে বলল, হ্যাঁ খুব বড় গঙ্গা আছে। আর রহমত আর্দালির সঙ্গে বেশ গল্প করব।

রহমতও আছে?

সায়েব থাকলেই তো আর্দালি থাকবে ?

ও !

মায়ের মুখটা যেন দূরবিসারী ঘাস বনের দিকে তাকানো এক হাঁ-মুখো গোরুর মত। ছেলেটা বুঝতে পারল না যে মায়ের চোরা দোলানিতে তার ঢুলুনি আসছে। সে মায়ের দুই স্তনের মাঝে মাথা রেখে দূরে মিলিয়ে যাওয়া স্বরে হেসে বলল, মেমসায়েব বউটা যদি তোর মত ভালো হয়, তবে আমি একদম পিটব না।

মা ভাবলেশহীন মুখে ফোঁস ফোঁস করে হাসল।

তারপর যখন ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল, তখন মায়ের চোখ দুটোতে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে ছেলের রুগ্ন শান্ত স্বপ্নভরা মুখটার দিকে চেয়ে। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, মাকি সায়েবের বিলেত দেখা তোর আমি মলেও হবে, কিন্তু বাবা, রোগের বালাই কাটিয়ে এ শরীলটুকু তোর বড় হবে কবে ?

জল পড়ছে ঝিম্ ঝিম্ করে। খুশি গলায় ডাকছে কোলা ব্যাঙ, হাট বসিয়েছে উঠোন জুড়ে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা। বস্তির হট্টগোল শান্ত হয়েছে। ঘরে বাইরে কাঁচা মাটি ফুঁড়ে উঠছে মোটা মোটা কেঁচো, মাংস খেকো কালো কালো ডেঁয়ো পিপড়ে, এখানে সেখানে চলেছে লাইন বন্দী হয়ে। যে সব ঘরগুলোয় জল পড়ছে, সেসব ঘরের লোকেরা গালাগাল দিচ্ছে বাড়িওয়ালাকে। বাড়িওয়ালার কানে তা যাচ্ছে না। আর গেলেও বুঝি কিছু আসত যেত না।

নন্দ আর হরিশ বসে আছে তেমনি।

এদিককার খাওয়ার পাট চুকে গেছে। কিন্তু কালোর এখনও খাওয়া হয়নি। কিছুক্ষণ আগে সে কোথায় বেরিয়ে গেছে। বোধ হয় কালকে তার কাজে যাওরার পাকা কথা আদায় করতে গেছে। আর খেতে বাকি আছে ফুলকি।

গোবিন্দ রান্নাঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে গেল ফুলকির ঘরের দিকে, সে এসেছে কিনা তাই দেখতে। সে আর বেশীক্ষণ বসে থাকতে চায় না। খিদে পেয়েছে। কালোর ভাত ঘরে নিয়ে রাখলেও হবে।

বৃষ্টির জল লেগে শির শির করে উঠছে গায়ের মধ্যে। উঠোনটায় যেন দই জমে আছে কাদার। ফুলকির ঘরের দিকে যেতে গিয়ে মনটা বারবারই থমকে যাচ্ছে গোবিন্দের। কেউ দেখে ফেললে না জানি কি ভাববে। ফুলকি যে বেওয়ারিশ!……বেওয়ারিশ! কথাটা মনে হতেই গোবিন্দের কৌতূহল বেড়ে উঠল। ফুলকির জীবনে তা হলে কি আছে, শরীরের রেখায় রেখায় অত বাহার নিয়ে কি মনে সে চলে। কালো বলেছে সে প্রেমযোগিনী। সে প্রেমযোগিনী কেমন? সে কি ঈশ্বরের প্রণয়িনী—সন্ন্যাসিনী? তাই বা কেমন করে সম্ভব। এ জগতের কথা তো সে জানে, দুর্বিনীত পুরুষের হাত থেকে বাঁচার কি অস্ত্র থাকতে পারে ফুলকির? বিশেষ করে এই সমস্ত এলাকায় ও মহল্লায় যেখানে খলিফা ওস্তাদ, সর্দাবদের কুটিল ও লোলুপ দৃষ্টি থেকে কারো রেহাই নেই। বাপ সোয়ামীর আশ্রয় থেকে যেখানে মেয়ে ছিনিয়ে নেয়, সেখানে ফুলকির মত মেয়ে অমন বুক ফুলিয়ে চলে কি করে।

গোবিন্দ দেখল অন্ধকারে আর একটি মূর্তি তার আগে আগে চলছে ফুলকির ঘরের দিকে। একবার চমকে উঠল বাড়িওয়ালা ভেবে।

কিন্তু না লোকটা একটু বেঁটে।······ও! নগেন। গরিলার মত বেঁটে ও মোটা নগেন। ফুলকির ঘরের দিকে সে কেন চলেছে এমন চুপিসাড়ে? তার মনে পড়ল কালোর কথা।

গোবিন্দ যেতে না যেতেই দেখা গেল নগেন ফিরে আসছে ফুলকির দরজার অন্ধকার কোল থেকে।

জিজ্ঞেস করল গোবিন্দ, নেই?

নগেন চমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। —কে নেই?

ফুলকি।

জবাব দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত স্তব্ধ রইল নগেন। চাপা গলায় জবাব দিল, না। বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে গোবিন্দের মুখটা দেখতে চেষ্টা করল। বলল, খুঁজছ তাকে?

হ্যাঁ, ভাত দেওয়ার জন্ত।

হুঁ হুঁ করে একটা শব্দ হল নগেনের গলা দিয়ে। সেটা রাগের না বিদ্রূপের বোঝা গেল না। বলল, শালা দুনিয়ার নিয়মটাই এমনি।

কেমনি?

এই কাউকে সেধেও খাওয়ানো যায় না, কেউ চেয়েও দুটো পায় না। নিয়ে এস না বাবা সেঁটে দিই।

কারখানা বস্তির বাসিন্দা হিসাবে গোবিন্দ অনন্ত। বালাইহীন ভবঘুরের জীবনে যা থাকা উচিত ছিল না, সেই ধিক্কার, সংকোচ, ভয়, লজ্জা তার অতীতের চরিত্রটার মধ্যে এখনো অনেকখানিই রয়ে গেছে। কেননা, তার যে আর একটা জীবন ছিল, দশ বছর আগের সে জীবনের চিহ্ন এখনো কিছুটা বুঝি রয়ে গেছে বুকে। সে সপ্রতিভ, হাসকুটে, গপ্পে, তার জীবনের গতির বেগ অনেকের অনেক এলানো পালে হাওয়া লাগিয়ে আকাশে মেলে দিয়েছে, কিন্তু তার মনের কোথায় লুকিয়ে আছে অনেকখানি আড়ষ্টতা, বিনয়,

বেদনা। আবার এও সত্যি যে, তার প্রতি পদক্ষেপে আছে এক বিচিত্র দ্বিধা, নিজের কাছে নিজের দুর্বোধ্যতা আর সেই কারণে মানসিক গ্লানিরও কমতি নেই। নিজের হৃদয়ের কাছে সে ফকির হুকুমবরদার, যার কাছে যখন সে আত্মসমর্পণ করে হুকুমমত থাকে তারই হাতে। এসব মানুষের জীবনে দুঃখই সার হয়। কিন্তু তেমন দুঃখবাদী নয় গোবিন্দ, প্রাণ তার আনন্দের সন্ধান করে, ঝাঁপ দেয় দুঃখ চাপা জগদ্দল পাথরের বুকে।

নগেনের কথায় মনটায় বড় ধিক্কার লাগল তার। আবার রাগও হল। সেধে খাওয়ানোর জন্ম ফুলকির সন্ধান করেছে সে সত্য, নগেন যদি খেতে আসত তাহলেও কি সে খোঁজ করত না? মন থেকে কোন স্পষ্ট জবাব এল না তার। কে জানে সে নগেন হলেও সত্যি খোঁজ করত কি না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে নগেন বিদ্ঘুটে গলায় হেসে উঠল। বলল, লাও ঠ্যালা, মাথায় বিষ্টি লিয়ে তুমি কি সত্যি ভাবতে লাগলে নাকি? না বাবা ফোর্‌টুয়েন্টি, আমাকে দিতে হবে না, সে ভাত যারটা তাকেই গিলিও।

গোবিন্দ হঠাৎ ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল, আমাকে কি তোমার মত মাগীর পেছনে ঘোরা মানুষ ভাবো?

নগেনের মুখটাও চকিতে কঠিন হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে হেসে বলল, ভাবলেই বা কি। কোন্ শালা না ঘোরে?

নিজের মনটাকে কিছুতেই ঠাণ্ডা রাখতে পারল না গোবিন্দ। অত্যন্ত তিক্ত গলায় বলে উঠল, তাই বেওয়ারিশ মেয়ের দরজায় রাতে টুঁ মারো

তুমিও তো যাচ্ছিলে বাবা। বলে আবার হেসে উঠে বলল নগেন, কালোও শালা এমনি বড় বড় বাত্ মারত, সে শালাও দেখি লটকে

পড়েছে। মগর টুঁটু। দেখ থোড়া কোশিশ করে। তবে অনেক জল, তল পাবে না।

গোবিন্দ দেখল গোঁয়ার নগেনের সঙ্গে তর্ক বৃথা। সে যা বুঝেছে তার আর নড়চড় হবে না। তবু বলল, কালোর সঙ্গে তুমি কারো তুলনা করো না। তার দিল অনেক বড়।

হঁ্যা, শালা হিজড়ের দিল তো অনেক বড়ই হবে। তবে ওদের হাতে মেয়েমানুষের পুতুলই থাকে ভালো। খেলবে আর কপাল ঠুকবে। ওসব ফুলকি টুলকির পেছনে কেন? একটা দুর্বোধ্য শব্দ করে সরে গেল সে। খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এসে দাঁড়াল গোবিন্দের মুখোমুখি। হঠাৎ যেন কিসের জ্বালা ধরে গেছে তার মনে। বলল, ক-দিন এসেই সব বুঝে ফেলেছ, না? বলছ, ফুলকি বেওয়ারিশ। তুমি আর কালো তাই ভাব, কিন্তু ফুলকি তো আমাদের। কবে সে বেওয়ারিশ ছিল? আর এখন ছুকরিটা রেণ্ডি হয়ে গেছে—কালসাপ। কী জান···কী জান তুমি?

বলতে বলতে নগেনের গলাটা চেপে এল একেবারে। তারপর হঠাৎ কেশো গলার বিদ্রূপ করে হেসে উঠে বলল, তুমি সোহাগ করে ভাত নিয়ে বেড়াচ্ছ। কিন্তু—

কি বলতে গিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে ফিরে যেতে যেতে শোনা গেল তার চাপা গলা, শালাদের খালি বড় বড় বাত্ আর বলিহারি ধৈর্য বাবা।

হঠাৎ গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে গেল। পাশের পাকা বাড়ির একটি জানলা চকিতে খুলে বন্ধ হয়ে গেল। উঁকি দিয়ে গেল এক ঝলক আলো।

গোবিন্দের ক্রুদ্ধ মনটা হঠাৎ অবশ হয়ে গেল যেন। নগেনের তীব্র চাপা গলার কথাগুলো শুনে তার মনে হল, সত্যি কালো ভিক্ষুকের

মত দুর্বল আর অন্ধকার নিরালাতে সে বুঝি সত্যি ফুলকির কাছে যাওয়ার জন্যই মাত্র যেতে চেয়েছিল। তবু দাঁতে দাঁতে পিষে সে হিসিয়ে উঠল, শূয়োরের বাচ্চা !

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল গোবিন্দের। অন্ধকারে তাকিয়ে কিছু ঠাওর করতে পারল না। পাশে হাত দিয়ে দেখল, কালো নেই। ডাকল, কালো।

জবাব নেই। আবার ডাকল, কালো।

এবার জবাব এল, কি বলছ ?

কোথায় যাচ্ছ এত রাতে ?

কালো বলল, রাত কোথা। চারটে বাজল যে ! যাই, নেয়ে টেয়ে আসি, আজ থেকে আবার কাজে যেতে হবে। বলে দরজাটা খুলে আবার সে বলল, তুমি ঘুমোও, উঠো না এখন, বুঝলে ?

হুঁ। বলে গোবিন্দ চোখ চেয়েই রইল। হয়তো ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু কালোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে, অন্ধকারে অবাক হয়ে সে ভিটকিলি মেরে পড়ে রইল। কিন্তু কি একটা হঠাৎ মনে পড়তেই সে আবার উঠে পড়ল। ডাকল, কালো।

চমকে উঠল কালো। বলল, ঘুমোওনি ?

না, একটা কথা মনে পড়ে গেল। গোবিন্দ উঠে ঘরের এক কোণ থেকে কি নিয়ে কালোর সামনে বাড়িয়ে দিল।

কালো বলল, কি ?

গোবিন্দ বলল, ভাত।

উভয়েই তাকাল উভয়ের মুখের দিকে। কিন্তু কেউ কারো কেউ

দেখতে পেল না অন্ধকারে। নিশ্চুপ, স্তব্ধ। শুধু পাশের বাড়িটার খোলা কল থেকে সমানে জল পড়ার একটা ছড়ছড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে তাল রেখে রাত্রির নৈঃশব্দ্যে ঝিঁ ঝিঁর ডাকের মত শোনা যাচ্ছে বুড়োটে গলার একটানা কথাহীন সুর।

কেন, কিসের ভাত, বলাটা দুজনের কাছেই এত অবান্তর মনে হল যে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না। কেবল কালো ফিস্‌ফিস করে বলল, তুই কি শালা সত্যি ফোরটুয়েন্টি ?

আমি ভগবান। বলে গোবিন্দ ধপাস্ করে আবার শুয়ে পড়ল।

নগেনের রাত্রের কথাগুলোই তার বারবার মনে পড়ছে। কেউ চেয়ে দুটো পায় না, কাউকে সেধেও খাওয়ানো যায় না। নগেনের কথার সেই হুল হুলের খোঁচা এখন তার বুকে বাজল যেন হাজার অপমানের ছুরি হয়ে। রাতভর ফুলকির ভাত নিজের এন্‌তেজারিতে রেখে এখন কালোর হাত দিয়ে পাঠানোর কথাটা যেন দুই থাপ্পড়ে তার মুখটা অন্ধকারে ঠেলে দিল। নগেনের বিদ্রূপ তবে মিথ্যে নয়।

কিন্তু কালোর মহব্বত !

অমনি কে যেন ধমকের সুরে আরও তীব্র বিদ্রূপ করে উঠল গোবিন্দের বুকের মধ্যে। ভাল রে তোর বিবাগী মন। কালোর পীরিতে উথ্‌লে ওঠে তোর যে সোহাগ, সে তো বাউণ্ডুলের ভাঙা মনের রং। কিন্তু এখানে সে রংএর দাম কি।

গোবিন্দের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার সেই দশ বছর আগের মানুষটা। যে কথাটা নিজের কাছেও আর তার স্বীকার করতে মন চায় না, সেটাই বারবার মনে আসে। দশ বছর আগে একদিন তাকে এখান থেকে পুলিস বার করে দিয়েছিল, বার করে দিয়েছিল এই চব্বিশ পরগণা জেলা থেকে। জেলা খারিজ করে দিয়েছিল। চাপা না নয়, আরও দুজনের সঙ্গে।

সেদিন সে ছিল একটা আগুনের মত মিস্তিরি ছোকরা। সব কিছু বোঝাবুঝির ধারটা কম ধারত, অল্প কথায় চটত। কারণ, কারখানায় সামান্য খোঁচা খেলেও সে ফোঁস করে ফণা তুলে ধরত। একটু কিছু হলেই, সোজা গোরাসাহেব ম্যানেজারের ঘরে ছুটে গিয়ে টেবিলের উপর ঘুষি মেরে কথা বলত। তখন সকলের কাছ থেকে সাড়া না পেলে সে একধার থেকে সবাইকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করত, থুতু দিত, আর বলত, তোরা ভীতু, ভেড়ার দল।... যুক্তির প্রশ্ন তুলতে গেলে তো মারমুখীও হয়ে উঠেছে কোন কোন দিন। তবু এক একটা দিন গেছে, যখন তাকে সামনে রেখে ক্যাপা মানুষের দল বন্যার বেগে ছুটে গেছে ম্যানেজারের ঘরের দিকে। সবাই বলত তাকে, সেই টরন্ ঘরের ছোকরা মিস্তিরি।

কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল না, ছিল হৃদয় আর সাহস। শিক্ষার চেয়ে বেশী আবেগ। তার সেই আবেগভরা বুকে সে নিজেকে বড় একলা মনে করত। কেননা, তার পরিবেশে শিক্ষা বা আবেগ কোনটাই ছিল না।

সেদিন কিছু লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকও তার সঙ্গে কথা বলত। গোবিন্দকে তারা যেন কি একটা ঠাউরেছিল। তারা গোবিন্দকে মানত, যেন সে একজন মস্ত কেউ। তাকে নিয়ে শেষ ছিল না আলোচনা বিলোচনার। কিন্তু শিক্ষিতদের প্রতি তার কেমন একটা সংশয় ছিল বরাবর। কেননা, সে ভেবে উঠতে পারেনি, এদের বুদ্ধিমত্তা তাদের এ জীবনের কোন শুভপথের শরিক সত্যি হতে পারে কি না।

তারপর কারখানার কাজের মাঝে হঠাৎ বোমা পড়ার মত একদিন সেপাই এসে হাজির হল জেলা খারিজের হুকুমপত্র নিয়ে।

বিস্ময়টা সকলেরই। তার ব্যাপারটাকে এতখানি বড় করে কেউ

কোনদিনই ভাবতে পারেনি। সেটা যেন আচমকা ভূমিকম্পের মত একটা হঠাৎ নাড়া দিয়ে চলে গেল। কারো যেন ভাববার বা করবার কিছু অবসর ছিল না। গোবিন্দেরও না। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সে যখন ছেড়ে গিয়েছিল এ জায়গা, সেদিন একটি কথা সে কারো সঙ্গে বলেনি। অসহ্য অস্থিরতা ও অভিমান তাকে বোবা করে দিয়েছিল। কি করে জানি না, এখানকার সব কিছুকে সে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। মনে হয়েছিল, যেন নির্বিবাদে তাকে সবাই নির্বাসনে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

নিস্তারজ ইছামতীর খেয়া পেরিয়ে যে মুহূর্তে সে গাঁয়ের পথ ধরল, সেই মুহূর্ত থেকে একেবারে ভোলবার চেষ্টা করল তার কয়েক বছরের কারখানার জীবন।

তারপরে তো একটা বিরাট পরিবর্তন। ঘর সংসার সব হারিয়ে পথকেই সম্বল করেছিল। এখন মনটা তার হয়ে গেছে অদ্ভুত শান্ত আর অমায়িক। জাত পেশার করাত বাটালি ছেড়ে বেহালার ছড়টা ধরেনি, এই যা। ভালো মন্দর প্রশ্নটা পর্যন্ত তার কাছে থেকে থেকে অবান্তর হয়ে যায়। দশ বছর আগের সেই জীবনটা যেন মনে হয়, অন্য কোন মানুষের গল্প কথা মাত্র। মনে হয় পাগলামী। এদের কাছে আত্মগোপন করে থাকাটাই তার আজকের মহানন্দ মনে হয়।

কিন্তু পথকে নিয়ে যেমন সে চিরকাল থাকতে পারল না, বুঝি নিজের মনের অজ্ঞাতসারেই চলে এল এখানে, যেমন আপনা আপনিই সে এখানকার সমস্ত কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ঠিক তেমনি করেই তার বুকের মধ্যে জ্বালাটা আজ বড় বেড়ে উঠল।

মনের মধ্যে তার ধিক্কার দিয়ে উঠল, ফুলকির ভাত এমনি রেখে দেওয়ার জন্য। সত্যি, ফুলকির সে কতটুকু জানে। কালোর সে আদরের প্রেমযোগিনী কিন্তু নগেনের কাছে সে কুলটা। কালো যার ভাত নিয়ে পিছে পিছে ঘোরে, তার তো তা সাজে না। সে তো কালো নয়।

আর তার অধিকারই বা কতটুকু! সকলে তা মানবে কেন? নিজের প্রতি ধিক্কার তার নগেনের খালি পেটের জ্বালার কথা ভেবে। তবুও নগেনের প্রতি মনটা তার বেঁকেই রইল। সে যে তাকে মেয়েমানুষের কথা বলে অপমান করেছে! আর কালোর কথা ভাবতে গিয়ে বুকটা তার টনটনিয়ে উঠল। তার বারবার ঘর ভাঙা জীবনে যে ফুলকির কাছে সে আবার মরতে চেয়েছে, না জানি সত্যি তাকে আবার মরতেই হয়। এত সবের মধ্যে ভিড়ে পড়ার অশান্তিতে তার বিবাগী মনটা এ ক-দিনের মধ্যে তাই বারবার পালিয়ে যাবার কথা ভেবেছে।

এখনো আবার তার সেই ভাবনাটাই যেন ফিরে এল। পালাই পালাই করে উঠল মনটা।

আবার ভাবে, কোথায়, সে কোন্ ঠাঁই? পথ আর উপোস, উপোস আর পথ। যারা নেই, তাদের জন্ম পথের কাছে লুকিয়ে কান্নার কি দাম আছে? সে তো বাউল নয়, জীবনের অভিশাপ তাকে ঘরছাড়া করেছে। তার ছেঁড়া আস্তিনের তলায় ভাঙা বুকের কোণে যে এখনো একটু রংএর দাগ লেগে আছে। কোথায় যাবে সে। জগত বড় মজার জায়গা। ছাড়ান পাবে না কেউ।

তার চোখের উপর হঠাৎ ভেসে উঠল দুলারীর সেই অপলক চাউনি। দুলারী। দুলারী নয়, ছুতোর বউ। মনে পড়ল গণেশের কথা। মরণের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্ম সে অন্ধগর্ভের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। গণেশের মত মানুষের জীবনেও এমনটা হয়।

সেদিনের পর সে আর গণেশের ঘরে যায়নি। যায়নি দুলারীর ওই চোখ দুটোর কথা ভেবেই। কিন্তু লক্ষ্য করেছে, গণেশের চোখ জোড়া অষ্টপ্রহর তাকে অনুসরণ করছে। গোবিন্দের মনে হয়েছে, হয়তো সে কিছু বলতে চায়। কিন্তু না, গণেশ কাছে এগোয় না। বাড়িওয়ালা

গিয়ে তাকে শাসাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে কাজে যাওয়ার জন্য। সবই যেন পাথরের উপর ঢিল ছোঁড়া।

সারা বস্তিও নির্বিকার। নির্বিকার হয়তো নয়, যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। গণেশ তাদের কাছে যেমন অসাধারণ, তেমনি অসাধারণ তার এই বউয়ের কাছে পড়ে থাকা। কিছু বলতে যাওয়াটা যেন তাদের নিজেদের কাছেই কেমন অশোভন মনে করে।

মনের সমস্ত তিক্ততাকে ফেলে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

উনুন জ্বলেছে, ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করেছে সারা বস্তিময়। সেই সুর-হীন গলার গান আরম্ভ হয়েছে। ঘরে ঘরে কাজে যাবার তাড়া।

গণেশের দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ভিতরে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। সে ডাকল, গণেশ!

অন্ধকার ফুঁড়ে গণেশ এসে দাঁড়াল তার সামনে। অদ্ভুত তার চোখের চাউনি, অপলক। যেন মৃত্যুদূতের প্রতীক্ষার অসহ্য স্তব্ধতা থেকে আচমকা উঠে এসেছে সে।

গোবিন্দ ভেবেছিল হয়তো গণেশ ঘুমিয়ে রয়েছে। কিন্তু তাকে এভাবে উঠে আসতে দেখে চমকে উঠল সে। ভালো করে তাকিয়ে দেখল, দুলারী ঘুমিয়ে আছে কিংবা পড়ে আছে চোখ বুজে। নিশ্বাসের ওঠানামায় শরীর নড়ছে তার। বলল, সব দিক তো মজিয়ে এনেছ আর কদ্দিন চালাবে? ঘরে না মরে, একটু খেটে মর না। কাজে টাজে যাও।

গণেশ একবার মুখ তুলল যেন কিছু বলবে। কিন্তু আবার মুখ নামিয়ে চুপ করে গেল, ফিরে তাকাল দুলারীর দিকে।

গোবিন্দ আবার বলল একটু বাঁকা হেসে, বেড়ে মরণের কলটি বের

করেছ। শালা মহব্বত না ফ্যাসাদ রে বাবা! পাওনাদার যে জেলে দেবে দু-দিন বাদে। তখন?

তবুও গণেশ চুপ করে রইল।

অস্বস্তিতে ভরে উঠল গোবিন্দের মন। কেমন একটা জেদের বশে হঠাৎ তীব্র গলায় সে বলে উঠল, ধু-র শালা তোর মহব্বত। বাঁচবার চেষ্টা নেই, দিন রাত্তির রোগীর কাছে পড়ে আছ। তাতে কি কেউ বাঁচে। মাইছুস্ জোয়ান। নিজের গলায় যে দড়ি দেয় তাকে কে বাঁচাবে? বাড়িওয়ালার বেড়ন না খেলে তোর হবে না।

মাইছুস জোয়ান। গণেশের ভাঙা গলায় কথাটা যেন ভেসে এল অনেক দূর থেকে। তারপর সে গিয়ে চুপচাপ বসে পড়ল বেড়ায় হেলান দিয়ে, মাথা নীচু করে।

গোবিন্দ বেরিয়ে আসতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। গণেশকে ওই রকম ভাবে সরে গিয়ে বসে থাকতে দেখে বুকটার মধ্যে তার মোচড় দিয়ে উঠল। যেন কোন নিষ্ঠুর যাদুকরের মন্ত্র-আচ্ছন্ন একটি জীব গণেশ। সে কাছে এসে আবার গণেশের পাশে বসে, তার মুখটা তুলে ধরল। ডাকল, গণেশ।

গণেশ তার দিকে তাকাল। শক্ত পুরুষের রুক্ষ চোখে তার জল নেই, কিন্তু যেন কান্না ভরা। গোবিন্দের মনে হল, কালোর চেয়েও গণেশের বেদনা যেন অপার। গণেশ যেন শিশু হয়ে গেছে। সে বলল গণেশকে যেন কতকালের বন্ধুর মত, কারো পরে ভরসা নেই তোর কেন? তুই না উঠলে যে শালা বউটা কেটে পড়বে। আমি বলছি ও বাঁচবে···মাইরি। তুই তোর কাজ করগে। সব ভার ছেড়ে দে আমার পরে।

গণেশ মুখ নামিয়ে বলল অত্যন্ত নীচু আর মোটা গলায়, আমি না থাকলে ও মরে যাবে।

গোবিন্দ বলল, তোর কথায়…তোরই একটা বউ আছে, আর যেন কারো নেই, ছিলও না। লোকে তো চেষ্টা চরিত্তিও করে…বলি তোরা দুটোতে মলে এ সমসারে কার কি আসবে যাবে ?

গণেশ মাথা নাড়ল। অর্থাৎ কারো কিছু আসবে যাবে না। তারপর দুলারীর দিকে একবার দেখে বলল, তুমি কেন বইবে এ ভার ?

প্রশ্নটা শুনে থমকে গেল গোবিন্দ। জবাব দিতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য তারী অসহায় বোধ করল সে। বলল, ভালো কথা, আমার এমন হলে তুমি দেখতে না ?

গণেশ যেন আঁতিপাঁতি করে কি খোঁজে গোবিন্দের মুখে।

গোবিন্দ এবার হেসে ফেলে। তোমাকে দেখেছি আর সেরেফ্ মজেছি ?

বলে গণেশের হাত ধরে কাছে টানল। বলল, এখানে যে যার নিজেকে নিয়ে মশগুল, মন চাইলেও কেউ কাউকে দেখতে পারে না। আমি দেখব, তুমি কাজে যাও।

তারপর হঠাৎ গণেশের কাছে মুখ নিয়ে বলল, বউ না হয় তোরই, সোয়ামী না হই, তোর মত সোহাগ তা বলে খুব করতে পারব।

বলে সে হা হা করে হেসে উঠল। যেন খানিকটা জোর করে টানা হাসি।

গণেশ খানিকটা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল গোবিন্দের দিকে। খানিকক্ষণ তারপর হঠাৎ বলল, তোমার মত মানুষ আমি আর দেখিনি।

গোবিন্দ বলল, আমার মত দেখেছ, কিন্তু তোমার মত মানুষ আমি দেখিনি।

দুজনে তারা চুপ করে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। গণেশের জ্বালাভরা চোখ দুটো যেন গোধূলির তারার মত করুণ হয়ে উঠল।

ফর্সা হয়ে আসছে দিন। মেঘমুক্ত আকাশ। বাইরে ছোট

ছেলেপিলেগুলোর সেই দৈনন্দিন প্রকৃতির পীড়ন শুরু হয়েছে। গলা শোনা যাচ্ছে বাড়িওয়ালার।

ঘরের অন্ধকার কেটে গিয়ে দুলারীর মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে খাটিয়ার উপর। তার বড় বড় চোখের অপলক দৃষ্টি এদের দুজনের দিকে।

সেই দিকে আর একবার দেখে গণেশ আবার কথা বলল। সে যেন গণেশ নয়, আর কারো গলা ভেসে আসছে ধীর আবহ সংগীতের মত, দোস্ত, তোমার কোন ঠিকানা জানি না, জান-পহচন্ নেই তবু আমার তকলিফ নিতে এসেছ তুমি।······তামাম বস্তি বলছে আমি বেয়াকুব। বলে, গরীব কুলি কাবাড়ির আবার মহব্বত! ওসব লাখ্‌পতির ঘরে সাজে। রানীর ব্যামো হলে রাজা বসে থাকতে পারে না, তার আবার······

চুপ হয়ে যায় গণেশ। তারপর হঠাৎ চাপা উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, ঝুটা বাত। লাখপতির জান রূপেয়া, রাজার মহব্বত সিংহাসনে, রানী তো পুতলা। এক যাবে হাজারটা কিনবে। আমি রাজা নই, একটা ফালতু আদমি। আমার তো জানের পরোয়া নেই, পরোয়া মহব্বতের। একটা আমার লাখ্ লাখ্, গেলে যে ফকির বনে যাব!

এমনিতেই গোবিন্দের মনটা বড় নরম। গণেশের এ কথাগুলো শুনতে শুনতে তার বুকের কোনখানটায় যেন গোপন কান্নার হাহাকার উঠল। সে বলে উঠল, তুই যে শালা আর এক রাজা, মহারাজার ব্যাটা!

গণেশ আবার কথা বলে উঠল। তার বুকটার এতদিনের গুমোট ঘরে যেন হঠাৎ হাওয়া লেগেছে। গোঁফদাড়ি ভরা মুখটা উত্তেজনায় কুঁচকে অদ্ভুত হয়ে উঠল। বলল, দোস্ত্, ফাগু তাঁতীর সুতো ভালো

ছিল না, চট খারাপ দেখে সাহেব ওকে খিস্তি করে লাগালে দুই ঝাপ্পড়। ফাগু শালা চুপ। আমার জান জ্বলে গেল। মিশিন ছেড়ে ছুটে গেলাম, শালা তেরি···

বলতে বলতে তার সারা শরীর ও মুখভাবে মনে হল যেন সাহেবের গলা টিপে ধরেছে।

সবাই রুখে দিল। পালিয়ে গেল কমিনা সাহেব।······এখানে শোধ নিতে পারি। কিন্তু এই দুলারী···ও ভিন্‌জাতের ছোটঘরের মেয়ে। গাঁয়ে যখন ওকে আমার ঘরে এনে তুললাম তখন, আমাদের ঘরের মানুষেরা আর ওদের জাতের লোকেরা আমাকে এমন পিটলে যে, জান খতম মনে করে ফেলে দিয়েছিল নদীর কিনারে। তখন এই দুলারী আমাকে নিয়ে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে ফিরেছে, সারা গায়ের খুন গাইবাছুরের মত চেটে চেটে তুলেছে, হাড়-গোড় ভাঙা টুণ্ডাকে কোলে করে রেখেছে। আর ও আজ মরতে বসেছে, এখানে আমি কার উপরে শোধ তুলব। কার উপর? তাই ভেবেছিলাম আমিও মরব···মরব ওর সঙ্গে।

গণেশের কথা শুনে আপনা থেকেই গোবিন্দের মুখ থেকে যেন বেরিয়ে এল, সাহেব দুশমন, ব্যামো কি তোমার মিতা? ব্যামো দুটোই, তবে রকমফের। শোধ যদি তুলতে হয় তো, দুটোর উপরেই তুলতে হবে।

গণেশের কোটরাগত চোখে তীব্র অনুসন্ধিৎসা, যেন অন্ধকারে কিছু হাতে ঠেকেছে, বলল, কিন্তু এযে সারতে চায় না।

সারবে কেন, বিগড়ে আছে যে! কালো যেন কথার খেই পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে, তাঁতী তুমি, বিম্‌ না চললে কি কর?

জাম ছাড়াই।

তবে জাম ছাড়াও, ও শালার চিজ গাঁটে গাঁটে দলা পাকিয়ে আছে,

ওকে চেঁছে ফেল। শরীলের জাম ব্যামো, ওটাকে ছাড়াতে হবে। এর নাম ইলাজ।

তারপর হঠাৎ গলাটা যেন অকারণে ধরে এল গোবিন্দের। আচমকা যেন টিপুনি লেগেছে অন্তরে। বলল ঢোঁক গিলে, আমাদের ক্ষ্যামতা কম, তবু হাল ছাড়ব না।

হাল ছেড়ে তো অনেক ঠকেছি, আর নয়।

একটা কলাপাতার বাঁশীর মত সরু শব্দে উভয়ে তারা দুলারীর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

দুলারীর কঙ্কাল মুখের সে এক বিচিত্র ভাব। তার নির্নিমেষ চোখের তারা কেবল গোবিন্দ-গণেশের দিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। দ্রুত নিশ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে নাকছাবি। ঠোঁট নড়ছে, আর অবিশ্বাস্য হলেও একটা অস্পষ্ট হাসির রেখা ঠোঁটের পাশে ফুটে তার সারা মুখটাকে যেন বদলে দিয়েছে।

গণেশ অমনি ঝুঁকে পড়ল দুলারীর মুখের উপর। কান এগিয়ে দিয়ে বলল, কী বলছ, বল।

স্বরটুকু প্রায় হারিয়ে গেছে দুলারীর। ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলল সে যেন, পরপুরুষের সামনে সোয়ামীর সঙ্গে কথা বলছে নও-বহুড়ি।

গোবিন্দ শুনতে পেল না সে কথা কিন্তু এই প্রথম দেখল গণেশের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে হাসি। কিম্ভূতাকৃতি মেঘের কোলের বিদ্যুতের মত সে হাসির গভীর রেখা তার গোঁফের পাশে ও চোখের কোলে।

হাসিটা আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়ল গোবিন্দের মুখে। বলল, কী বলছে?

গণেশ বলল, বলছে, তোমার কথা ঠিক। ওদের ঘড়িকলটা অমনি বিগড়ে যেত মাঝে মাঝে।

এ বুঝি কাজ করত কলে?

তবে? সলতান নোকরি ওর···আর বলছে, আমাকে কারখানায় যেতে হবে।

হাঁ?

হাঁ!

দুজনেই তারা হেসে উঠল। সে হাসি শুনে যেন আবার লজ্জা পেল দুলারী, মরা চোখ তার হাসি ও লজ্জায় মধুর হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি চোখ বুজে গেল তার। মুহূর্ত পরে সে চোখের কোল ছাপিয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল। অনেক দিন পরে তার রোগগন্ধপূর্ণ অন্ধকার ঘরটাতে সাড়া পড়েছে হাসির। অনেক দুর্দৈবের মধ্যেও সে শুনতে পেয়েছে গণেশের হাসি, যে হাসিটুকু তার প্রাণের চেয়েও দামী। আর গোবিন্দের মুখখানি যেন এঁটে বসে গেছে তার মনের মধ্যে। ইচ্ছে করল, গণেশের মত সেও ওকে এখুনি একবার ডেকে উঠবে, দোস্ত?···ভাবতে সরমও লাগে। ও যেন তার ফাটা সানাইয়ে ওস্তাদ বাজনদারের মত সুরের ঢেউ তুলে দিয়েছে।

গোবিন্দের হাত ধরে গণেশ বলল, দোস্ত্, আমি তবে দৌড়ই হাজিরা দিতে?

গোবিন্দ বলল, দিল ঠুকে বেরিয়ে পড়, সব ভার আমার। তুমি শুধু ওকে বাইরে চালার ছায়ায় শুইয়ে দিয়ে যাও।

হঠাৎ একটা খিল্‌খিল্ হাসির শব্দে গোবিন্দ ফিরে দেখল, বাইরে বাড়িওয়ালা একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে চোখ খোঁচ করে আর কাঁসর ফাটানো হাসিতে দুলে দুলে উঠছে ফুল্‌কি তার পাশে।

বাইরে আসতে দেখা গেল অনেকেই নিজেদের মধ্যে নানান কথা

জুড়ে দিয়েছে। কাজে বেরুবার পূর্ব মুহূর্তে মানুষগুলো যেন উপভোগ করছে একটু মজা।

ফুলকি ভ্রূ তুলে কটাক্ষ করে বলে উঠল, শুধু ফোরটুয়েন্টি নও তুমি আরও তুক ফুঁক জানা আছে দেখছি তোমার।

গোবিন্দ বলল, তুমি তো ফুঁক তুকের বাইরে, তোমার তবে ভাবনা কি ?

বাইরে কি গো ! বস্তির মধ্যে এমন সব্বনেশে মানুষ থাকলে কি আর রক্ষে আছে ? বলে সে আবার হেসে উঠল।

সে হাসিকে স্তব্ধ করে দিয়ে নগেন অট্টহাসি হেসে উঠল প্রায় নাটকীয়ভাবে।

গোবিন্দ ভাবল নগেনের এ হাসির খোঁচা তারই প্রতি। এদিকে ফুলকির মুখের হাসিটুকু যেন দুরন্ত ঝড়ের বেগে ঝরে গেল শুকনো পাতার মত।

বাড়িওয়ালা জিজ্ঞেস করল গোবিন্দকে, সাধুগিরি করতে নাকি আগে ?

করতাম না, এখন থেকে করব। জবাব দিল গোবিন্দ।

লোমশ পেটটাকে খোঁচ করে, চোখ দুটোকে আরও খানিকটা ভ্রূর তলায় ঢুকিয়ে বলল বাড়িওয়ালা, হুঁ ! কথার রাজা আমার !……এস তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে ! চল।

তারা দুজন চলে যেতেই, ফুলকি সকলের দিকে একবার দেখে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল সেখান থেকে।

তার চলে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে কয়েকজন আবার হেসে উঠল।

কার গলায় শোনা গেল, কিন্তু যা-ই বল, ওই ফোরটুয়েন্টিওয়ালার কোন মতলব আছে। কেননা, ও শালা বড় ভালমান্‌ষি দেখায়।

হ্যাঁ, ভালমানুষ মানেই ছেলে খাবার যম। কে আর একজন বলে উঠল।

লিকলিকে লম্বা মানুষ একটা প্রায় ঘুষি বাগিয়ে উঠোনের মাঝখানে

এসে সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, শালা বেশী ওস্তাদি করলে হাঁকব একদিন কোঁতকা……

যাতে দুনিয়ার ভালমানুষগুলো সব শালা খতম হয়ে যায়। নগেন বলে উঠল তার স্বাভাবিক গলায়।

কথাটা তার এমন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক যে, কোঁতকা হাঁকনেওয়ালা লোকটা আর একবার আস্ফালন করে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থমকে মাড়িয়ে ফেলল এক গাদা ময়লা।

অমনি সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মাদারি খেলোয়াড় তার ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে বলল, ঙ্যাটাজ কোল্ মাদারি খেল্।

এমনি ইংরেজি সে মাঝে মাঝে বলে থাকে।

কিন্তু ময়লা মাড়িয়ে ফেলা লোকটা তার সরু গলায় ফাটা বাঁশীর মত চিৎকার করে উঠল, কোন্ গিদ্ধরের বাচ্চা এখানে এ কাজ করেছে, আমি জানতে চাই।

যেন সে-ই এ বস্তির মালিক। কিন্তু তার ফল ফলল সাংঘাতিক। বাচ্চাদের যত মায়েরা ছিল, তারা সব একসঙ্গে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর, সে গিদ্ধরের বাচ্চা তোর বাপ, তোর চোদ্দ পুরুষ রে গেছো ভূতের বাচ্চা!

লিকলিকে লম্বা লোকটা প্রায় আঁতকে উঠে, ময়লা মাড়ানো ঠ্যাংটা তুলে, এক পায়েই ছুট দিল পোঁ পোঁ করে, যেন বাচ্চাদের এক্কা-দোক্কা খেলার দৌড়।

হাসিতে চিৎকারে ডুগডুগির শব্দে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার সারা বস্তিময়। কেবল নগেন যে কালকে রাতেও গোবিন্দকে কটূক্তি করেছে, সে আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল, লোকটা শালা সত্যি ফোরটুয়েন্টি করে দিচ্ছে।

বাড়িওয়ালা গাঁজায় দুটো লম্বা টান দিয়ে, কলকেটা বাড়িয়ে দিল গোবিন্দের হাতে। তারপর কয়েক মুহূর্ত ভোম্ হয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, দেখ ফোরটুয়েন্টি, একটা ভারী ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। মনে হয়, তোমার খানিক বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, একটা মতলব দিতে পার ?

গোবিন্দ প্রমাদ গণল। লোকটা এখুনি বোধ হয় পাকা বাড়ি তোলার পরামর্শ চাইবে। বলল, এখন যে আমার উনুনে আগুন দিতে হবে ?

সেটা একটু বাদে দিও। বলে বাড়িওয়ালা একবার ভালো করে দেখে নিল গোবিন্দের মুখটা। বলল, দেখ, আমার জমিটা আগের আইনের গুণে ঠিকা থেকে মৌরস হয়ে গেছল, তখন ছিল অন্য জমিদার। এর পরে যে জমিদারটা এল, সে শালা আসলে ছিঁচকে বেনে। গুড় বেচে বড়লোক হয়েছে। সে ব্যাটা নতুন আইনের প্যাঁচে ফের ঠিকে বানিয়ে দশ বছরের মেয়াদী করে দিয়েছে। এখন কি করা যায় ?

গোবিন্দ ব্যাপারটা আগেই শুনেছিল। কিন্তু এতখানি জানত না। জিজ্ঞেস করল, এ নয়া জমিদার কি তোমার খাজনা বাড়িয়েছিল ?

হাঁ।

তুমি বাড়তি খাজনা দিয়েছিলে ?

হাঁ।

হাঁ ? গোবিন্দ অবাক হয়ে গেল। কেন দিলে ?

বাড়িওয়ালা বোকার মত বলল, চাইলে যে !

হতাশায় মাথা নেড়ে বলল গোবিন্দ, তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেছে। এবার পাত্‌তাড়ি গুটোও। বাড়তি খাজনা যখনি দিলে, তখনি তো তুমি ফের ঠিকে মেয়াদ মেনে নিলে, তা জানো না ?

বাড়িওয়ালা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। গোবিন্দ বিদ্রূপে হেসে বলল, শালা এমন মানুষও জগতে আছে। উল্টে এট্টা নালিশও তো করতে পারতে ?

তাতে কি হত ?

কী না হত ? আগের দলিল দেখিয়েই তো তুমি মৌরুসীপাট্টা পেতে ? হাজার কেননা জমিদার বদল হোক্, ওদের আইনেই পেরজার ভোগ দখল কেউ নষ্ট করতে পারে না !

কিন্তু ওদের আইনেই তো এটা হল।

সে তো তুমি বোকা পেরজা বলে। এখনকার যে রাজা, পেরজা তার থেকে এক কাঠি সরেস না হয়েছে তো মরেছে। এও জানো না ?

কিন্তু—

কিন্তু টিন্তু ছাড়। তোমার মেয়াদ আর কতদিন ?

বছর খানেক মাত্র।

হতাশা ভরে মাথা ঝোঁকে বলল গোবিন্দ, ও ! খালি ছিলিমে দম্ দিচ্ছিলে অ্যাদ্দিন ? শিগগির তোমার দলিল পত্তর নিয়ে একটা ভালো উকিল ধর।

তা হলে আমি কি করব ?

বাড়িওয়ালার এ দারুণ অসহায় গলার স্বরে অবাক হয়ে গেল গোবিন্দ। লোকটাকে দেখে মনে হল তার, এ সেই বাড়িওয়ালাই নয়। কোথায় সেই ভ্রূকুটি পাথুরে কাঠিন্য আর বিদ্রূপ ভরা ভারিক্কী চাল।

এ যেন আর কেউ, চালচুলোহীন একটা অত্যন্ত সাধারণ ভালমানুষ বলতে যা বোঝায়। দুটো শান্ত চোখে উদ্বেগ, মোটা ভ্রূতে দুশ্চিন্তার রেখা। গোঁফ জোড়া যেন ধ্বসে পড়েছে।

গোবিন্দের মনে পড়ল সদী বুড়ির কথা। মানুষটা এত পোড় খেয়েছে, কিন্তু মাথায় কিছু নেই। সে না বলে পারল না, তুমি কি এটাকে রামরাজত্ব ভেবেছ নাকি ?

আবেগে বাড়িওয়ালার মোটা গলাটা যেন চেপে এল। বলল, না। কিন্তু কোরটুয়েন্টি, রামজী আমার আদর্শ। এই যে সব ভাড়াটের দল,

এরা তো আসলে আমার, মানে···পেরজাই, কি বল ? আর, সত্যি, আমি এদের রামের মতই পালন করতে চাই। মানে ঠিক বাপের মত।

অন্ত সময় হলে গোবিন্দ হয়তো হাসিতে ফেটে পড়ত। কিন্তু বাড়ি-ওয়ালার স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখটার দিকে তাকিয়ে সহসা তার মুখে কোন কথাই জোগাল না।

ভক্তিতে ভগবত পাঠের মত অপূর্ব গম্ভীর আর ব্যথিত সুরে ভরে উঠল তার গলা, ফোরটুয়েণ্টি, ভালো মানুষ আমার কাছে যে আসবে, তাকে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে রক্ষা করব, সমস্ত তকলিফ নেব। এখানে যে একবার এসেছে, সে আর কখনো আমাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। কেন ? না আমি ওদের রাজার মত পালন করি। দেখ, ওই গণেশকে এ এলাকার কোন বাড়িওয়ালা ঘর দেয় না, পুলিসের বড়বাবু আমাকে কতদিন শাসিয়েছে গণেশকে তাড়িয়ে দেবার জন্তে, আমি ওসব থোড়াই কেয়ার করি। গণেশকে আমি বুঝেছি, ও যা-ই হোক্, একটা খাঁটি ছোক্‌রা। বস্তি হোক আর ভাগাড় হোক, এটা আমার রাজ্য, এখানে আমার যাকে খুশি রাখব। কি বল ?

গোবিন্দ বলল, কিন্তু, এরা তো তোমাকে ভাড়া না দিয়ে ঠকায় ?

উত্তেজনায় স্ফীত হয়ে উঠল বাড়িওয়ালার মুখ, তুমি একটা সত্যি ভবঘুরে উজবুক। ওদের একটা নেড়ি বিল্লিও ঠকিয়ে মুখের রুটি খেয়ে ফেলে। ওরা ঠকাবে আমাকে ? তা যদি জানত ওরা, তাহলে বিষে বিষ মরত। এক ভাঁড় তাড়ি খেয়ে ওরা পেটটাকে চোখ ঠারে। বলতে বলতে তার গলাটা সরু হয়ে এল, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেল অসীম শূন্তে। দু-হাতে মুঠো করে টেনে ধরল বুকের বড় বড় চুলের গোছা। ফোরটুয়েণ্টি, তোরা সবাই অষ্টপহর দুঃখের কথা প্যাঁচাল পাড়িস্ নিজের কথা বলতে আমার মন চায় না। তবু বলি, মানুষের পেটে জন্মে আমি ছিলাম যেন কখনো ধোবীর গাধা কখনো ছ্যাকরা গাড়ির

ঘোড়ার মত। না মা, না বাপ। কিন্তু পুরনো কথা বলে কী লাভ! নিজের কথা ভেবেই ওদের উপর আমি জুলুম করিনে ভাড়ার জন্তে। এটা ওদেরই রাজ্যি, ওরা এটাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। তবে আমি কেন? না, নিমিত্ত। খাঁটি রাজার এ-ই চাল। তা বলে বেতমিজি করলে কি আর শাসন করব না? দরকার হলে ঠ্যাঙাব, ঠিক বাপের মত। কিন্তু বস্তির মালিকদের মত জানে মারব না। বলে সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, শুনি, এ সন্‌সারের তিন ভাগই জলে ডোবা। সে জল আমাদের দুখ তকলিফের দরিয়া, আর ডাঙাটুকু যেন সুখের কলিজা। কিন্তু, আজ কোথায় এসে ঠেকেছি··· নিজেই জানি না।

বলে সে তার লাল চোখ দুটো হাত চাপা দিয়ে বসে রইল।

নির্বাক গোবিন্দ কলকে হাতে হাঁ করে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। মনে হল, ডাঙা নয়, সর্বনেশে চোরাবালির কিনারে এসে ঠেকেছে লোকটা। বাড়িওয়ালা তার নিজের কথা কিছুই বলল না, কেন না ওর জীবনের দুখ দরিয়ার ঢেউ বুঝি কোন মানুষ সইতে পারবে না। কিন্তু গোবিন্দের বুদ্ধির সীমা থাকলেও এটা সে বুঝেছে, ভাবনায়, চিন্তায়, জীবনের ব্যয়ে জমায় মানুষটা সবছাড়া সবহারা একটা মস্ত মহৎ, কিন্তু একেবারে যেন ব্যর্থ। এ সংসারের আইনে ওর সবটাই পাগলামি! আসলে ওর এ পাগলামিটা ওর বুকের লুকোনো মস্ত ঘা-টার উপর হয়তো নিয়ত মলমের প্রলেপের মত কিম্বা বলতে হয়, দারুণ বিদ্বেষে, সব কিছুর সঙ্গে নিজের জীবনটাকেই লোকটা বাজী রেখে বসে আছে। এত বড় শরীরটা নিয়ে লোকটা বসে আছে, সেটা কিছুই নয়। শুধু একটা পাহাড় যেন। পাথরের ভিতরে কি কথা আছে, কে জানে সে কথা!

বাড়িওয়ালা আবার তেমনি অসহায়ের মত কথা বলে উঠল, কিন্তু যাদের

জন্য এসব ভাবি, তারা সব এক একটি মহা ছ্যাঁচড়া, বেতমিজ। ওদের মগজে কিছু নেই। ফোরটুয়েন্টি, তোমার কথামত আমি একটা আখেরি চানোস্ নেব, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। দেখি শালা একবার দেওতার মারটা।

হাসতে হাসতে কান্নার মত একটা দোভাবা যন্ত্রণায় ভরে উঠেছে গোবিন্দের বুকটা। সে কি বলবে, ভেবে পেল না। লোকটা তার নিজের কাছে এত খাঁটি যে, ওকে কিছুই বলা যায় না।

ফোরটুয়েন্টি ঝট্ করে সরে বস। হঠাৎ ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল বাড়িওয়ালা, বিরিজামোহন শালা আসছে, ওর সামনে তুমি আমাকে হুজুর বলে ডাকবে। ও শালা একটা জাত খচ্চর, চারটে বস্তির মালিক।

আচমকা বিস্ময়ের ঝোঁকটা কাটিয়ে ওঠবার আগেই গোবিন্দ দেখল বিরিজামোহন আসছে এদিকেই। রোগা, বেঁটে ফর্সা লোকটা কাছে আসতে দেখা গেল জরি-পাড় কাঁচির ধুতি পরেছে ফুলকোঁচা দিয়ে, হাঁটু অবধি ঝুলে পড়েছে কুঁজো গায়ে পরা সূক্ষ্ম আদ্দির কলিদার পাঞ্জাবী, মাথায় দেশী টুপি, পায়ে বুটিদার নাগরা। লোকটার মুখের চামড়া যেন অকালেই ঝুলে পড়েছে! কুত্‌কুতে দুটো চোখের তীক্ষ্ণ শিকারীর দৃষ্টিতে যেন সে আগে পাছে কেবলই শিকার খুঁজছে। ঠোঁটের কোণে ও ওই চোখে তার একটা ছলনার নোংরা হাসি জ্বল্‌জ্বল্ করছে। লোকটাকে গোবিন্দ আরও একদিন দেখেছে। সেদিন লোকটার একটা কথারও জবাব দেয়নি বাড়িওয়ালা। খানিকক্ষণ বকে বকে আপনিই চলে গিয়েছিল। ওর উপস্থিতির কারণই হল, বাড়িওয়ালাকে খানিকটা অপদস্থ করা।

বিরিজামোহন বাড়িওয়ালাকে বলল, জয় রামজী বাবু সাহেব, খবর সব ভালো?

বাড়িওয়ালা ইতিমধ্যেই তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা রুক্ষ

গাম্ভীর্যের মুখোশে ঢেকে ফেলেছে নিজেকে। পা দুটো মাটি থেকে তুলে, পা ছড়িয়ে খাটিয়ায় বসে সে আগে বলল গোবিন্দকে, এক ছিলিম বানাও। গোবিন্দ বলল, জী হুজুর।

তারপর লোকটার দিকে ফিরে বলল, জয় রামজী। আসুন, তছরিফ রাখুন।

কিন্তু তছরিফ রাখবার আর খাটিয়া ছিল না। বসতে হলে মাটিতে বসতে হয়। লোকটা দাঁড়িয়ে থেকেই বাঁধানো দাঁত দেখিয়ে বলল, আপনি বসলেই আমার বসা বাবুসাহেব, তাতে আর কি হয়েছে। বলে লোকটা এক চোখ বুজে একটা ইঙ্গিত করল এদিকে চেয়ে থাকা গোবিন্দকে। তারপর পকেট থেকে একটা রাংতার মোড়ক খুলে বাড়িয়ে ধরল বাটা সিদ্ধির সুগন্ধি গুলি। —আসুন বাবুসাহেব। মহাদেবের পেসাদ।

বাড়িওয়ালা বলল, ওসব চলে না। আমি মহাদেবের অন্য পেসাদ খাই, সেটা খেলে আপনার কলিজা ফেটে যাবে।

বিরিজামোহন খুকখুক করে হেসে একটা গুলি কোঁত করে গিলে ফেলল। বলল, শত হলেও আপনি একটা মালিক আদমি, আপনাকে ছাড়া আর কাকে নেশায় চিজ্‌ দিই। অর্থাৎ বাড়িওয়ালাকে বস্তির মালিক বলে সে উপহাস করছে। বলে আবার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে এগিয়ে দিল, আপনার মেহেরবাণী ?

গোঁফজোড়া মুচড়ে দিয়ে বলল বাড়িওয়ালা, ঠকানো পয়সার নেশা আমি করিনে।

আপনি কিসের পয়সায় নেশা করেন ?

নিজের পয়সায়।

বিরিজামোহন আবার হেসে উঠে একটা সিগারেট ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, সত্যি, একটা কথা শুনে আর না এসে পারলাম না।

শর্ত হলেও আপনি আমার একই পেশার লোক। বস্তিটা তো উঠে যাচ্ছে, এবার আপনি কি করবেন বাবুসাহেব ?
নিষ্ঠুর হাসিতে বেঁকে উঠল তার ঠোঁট।
বাড়িওয়ালার গলায় আস্তে আস্তে তিক্ততার ঝাজ মিশতে আরম্ভ করেছে। সে বলল, চোট্টার আর আমার পেশা এক নয়। আর আমার বস্তি ওঠার কোন কথা আমি জানিনে।
বিরিজামোহন সেই একঘেয়ে বিদ্রূপের সুরেই বলল, জমিদারের কাছে শুনলাম, মেয়াদ খতম হয়ে গেছে ?
আমি শুনিনি।
তবে শুনুন—
কোন দালালির দরকার নেই। বলে বাড়িওয়ালা গোবিন্দের হাত থেকে গাঁজার কলকেটা তুলে নিল।
কিন্তু বিরিজামোহন দমবার পাত্র নয়। বলল, তাহলে আপনার পাকা মোকামের প্যালেনটা কদ্দুর হল ?
বাড়িওয়ালা এবার হঠাৎ খাটিয়া থেকে পা নামিয়ে বলল নির্মম গলায়, কোন ঠগ্ জুয়াচোরকে আমি তা বলতে চাইনে।
মুহূর্তের জন্য একটু থমকালো লোকটা। হঠাৎ ঐ প্রসঙ্গ ছেড়ে গোবিন্দকে বলল, তোকে যেন চিনি চিনি মনে হয়।
গোবিন্দ যেন এরকম একটা জিজ্ঞাসাই প্রত্যাশা করছিল। কেননা, দশ বছর আগে লোকটা তাকে বিলক্ষণ চিনত।
কিন্তু তার আগেই বাড়িওয়ালা চাপা গলায় প্রায় গর্জে উঠল, কোন শালার ওকে চেনার দরকার নেই।
ধ্বক্ করে জলে উঠল লোকটার চোখ দুটো। একবার বাড়িওয়ালা ও গোবিন্দকে দেখে হঠাৎ পেছন ফিরে, সামনে ঝুঁকে লোকটা কুঁজোর মত দুলে দুলে চলে গেল।

খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, দাঁড়া গুণ্ডামি তোর বেরুবে। ডাকাত বস্তি তোর ভাঙল বলে।

বাড়িওয়ালাও চেঁচিয়ে উঠল, তোর বাপের বস্তিরে শালা!

কিন্তু গোবিন্দ জানত, বিরিজামোহন আবার আসবে, অমায়িক হাসবে আর থেকে থেকে এমনি বার বার হুল ফুটিয়ে নিষ্ঠুর আনন্দে চোখ কোঁচকাবে।

দাঁতে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল বাড়িওয়ালা, শূয়োরের বাচ্চা!

গোবিন্দকে বলল, দেখলে, কিরকম পেছনে লাগতে আসে শালারা। জান শালার টিকটিকির মত, টিপুনি দিলে অক্কা পেয়ে যাবে।

বলে গাঁজার কলকেটা বাগিয়ে ধরে টানতে গিয়ে আবার থেমে বলল, ওদের কাছে ডাঁট দেখাতে হয় সব সময়। মানে, আমি তো বাড়িওয়ালা কিনা, ওদের কাছে সেটা সব সময় দেখাতে হয়। নইলে ওকে আমি কুত্তা বলেও ডাকি না।

গোবিন্দ আর কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারল না বাড়িওয়ালার দিকে। মানুষটার পাগলামির কথা সে যত ভাবল, তত যেন গুমরে উঠতে লাগল তার বুকটা। সে তাড়াতাড়ি ভেতরে যাওয়ার সেই গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কলকেটা আর টানা হল না বাড়িওয়ালার। গোবিন্দ চলে যাওয়ার পথের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল তার। দু-হাতে গলাটা চেপে ধরল এমন ভাবে, যেন ভেতর থেকে কোন ঠেলে আসা জিনিসকে রোধ করছে। তবু এ নিষ্ঠুরদর্শন মানুষটার লাল চোখ দুটো ভিজে উঠল যেন। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, বারবার আমি ফকির······একটা ফকির।······

ওরে ফকির হয়ে আমি ছুটেছি আজ তোর পেছনে,

দেখি, আমারে না ধরা দিয়ে পালাস্ কেমনে।

জলদে গান ধরেছে আবেগভরে সেই বুড়োটে গম্ভীর গলা।

আকাশে মেঘ ফকির বেশে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে দেশান্তরে। পেছন টান নেই, বাঁকাবাঁকি নেই ডাইনে বাঁয়ে। তবু মাঝে মাঝে থমকে যেতে হয়, হাওয়া না থাকলে।

কেটে গেছে আষাঢ়ের ঘটা পটা, ধারা বয়ে গেছে শ্রাবণের, পচানি মজেছে ভাদরের, গুমসোনি কাটছে আশ্বিনের। হেমন্ত আসে আসে। আকাশের নীলে তার ঝক্‌মকানি।

ভর দুপুরে, বি টি রোড থেকে নিউ কর্ড রোডের মাঝে রাবিশ ফেলা রাস্তাটা যেন ঝিম মেরে পড়ে আছে। তার ধারে বস্তিটা পড়ে আছে যেন মুখ গুঁজে জবুথবু হয়ে। নতুন খুঁটি বিবর্ণ হয়েছে, ঘুণ ধরেছে পুরনো বাঁশে। শ্যাওলা জমেছে খোলার চালায়, খানিক খানিক লালচে আভা কোথাও। খোলার আসল রং ওই লাল। বজায় রয়েছে যেন ভাঙা মনে রংএর ছোঁয়ার মত। ফকিরের ঘরের চালা যে!

পাকা বাড়িটার পেছনের জানলা দিয়ে ফেলা কুটনোর অবশিষ্ট, কাগজের টুকরো, ন্যাকড়ার ফালি আরও কত কি পড়ে পড়ে চালার একটু জায়গা খানিকটা ঢিবি মত হয়ে উঠেছে।

গঙ্গার তীর থেকে ভেসে আসা কারখানার একটানা শব্দের সঙ্গে, কর্ড রোডের ঝোপের ছায়াবাসী ঘু ঘু-র ঘুক্ ঘুর্র্ তাল যেন মন্দীভূত করে দিয়েছে দিনের গতিকে।

গোবিন্দ হাসছে রান্নাঘরের রকে বসে বসে। হঠাৎ মনে হয় হাসছে না, বুঝি হাসির ছলে কাঁদছে। বন্দী হয়েছে ফকির। মুক্তি তার আসেনি, বুঝি নিজেও ভুলে গেছে মুক্তির কথা। আজ আর সে মুক্তি চায় না। মহাবন্ধন তাকে জড়িয়ে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে।

সে হাসছে ওই রুগ্ন ছেলেটার দিকে চেয়ে। মাকি সাহেবের সঙ্গে বিলেত যাত্রার আগে সে পেয়েছে ফোর্টুর্ণিষ্ট চাচাকে। গোবিন্দ আজ সব বাচ্চাদের ফোর্টুণিষ্ট চাচা হয়েছে। সমস্ত বস্তিটা আজ ফোর-টুয়েণ্টি বলতে অজ্ঞান। মেয়েরাও ইস্তক তাকে সঙ্গী করে নিয়েছে। সকলের সব কিছুতে আছে সে।

গণেশ আর দুলারীর সে দোস্ত্। প্রাণের বন্ধু। দুলারীও আরোগ্যের পথে। মাদারি খেলোয়াড়ের সে ফেরেশ্‌ত্। কেবল তার সঙ্গে কথা বলে না নগেন। দুরন্ত অভিমানে বুক পুড়ে গেছে কালোর। সে হদিস হারিয়েছে ফোরটুয়েণ্টির বিচিত্র মনের। গোবিন্দ আর ফুলকির ভাত রেখে দেয় না। কালো নিয়ে রেখে দেয় নিজের এন্‌তেজারিতে।

কিন্তু গোবিন্দ আসলে নিজেকে বন্দী করেছে অন্যত্র। তার পরিচয় আজ মহল্লায় মহল্লায়, এলাকায় এলাকায়। বিশেষ এই বস্তির মামলাটা কেন্দ্র করেই গোবিন্দ আজ ছড়িয়ে পড়েছে। সে আজ আর সে মানুষটি নেই। সে বাইরে যেতে শুরু করেছে, আলাপ জমাতে আরম্ভ করেছে দশ বছর আগের সেই ছেড়ে যাওয়া দোস্ত্ ইয়ারদের সঙ্গে।

আসে না আসে না করেও গোবিন্দের ঝিমিয়ে পড়া পালে হাওয়া লেগে গেছে। একটা অদ্ভুত পরিবেশ গড়ে উঠেছে তার চারপাশে। এ মানুষটির মাথায় বস্তির সব ভার চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে বাড়িওয়ালা। গোবিন্দও যেন এ কাজটি পেয়ে বেঁচেছে। এ জন্ম তার ছুটাছুটির শেষ নেই, অন্ত নেই ভাবনার। আর যাই হোক্ সে বুঝেছে শুধু মাত্র বাড়িওয়ালার স্বার্থরক্ষার জন্যই তার এত মাথা ব্যথা নয়। অনেকের অনেক দুর্দশা জমা রয়েছে এর মধ্যে।

জমিদার ও এ-বস্তির বিরুদ্ধ পক্ষরা যখন সবাই এটার উচ্ছন্ন যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত, ঠিক সে সময়েই এ মামলার খবরটা একটা দাবানলের

মত ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সেই সঙ্গেই রটনা হয়ে গেছে, কে এক ফোরটুয়েন্টি নামধারী এসব করছে। কেননা ওই পাগলা বাড়িওয়ালাটার তো কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। বিশেষ এ বস্তিরই অনেকের এ রকম একটা বিশ্বাস আছে।

কথাটা ছড়িয়েছে নানান্ রকম ভাবে। বিরুদ্ধ পক্ষ বিরিঞ্চিমোহনের দলের শেষ নেই ভাবনার ও কৌতূহলের। কেউ বলছে, ফোর-টুয়েন্টি একটা বাহাদুর ছোকরা। আসলে ছোকরা বাড়িওয়ালারই ছেলে, মুলুক থেকে এসেছে। কেউ বলছে, সে একটা লেখাপড়া জানা মহা দিগ্‌গজ, নইলে এ রকম মামলাটা চালাচ্ছে কি করে। আবার কেউ বলছে, ও একটা জেল-পালানো দাগী, ওইখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে, কেউ বা একেবারে সাধু-সজ্জন বলেও চালিয়ে দিয়েছে।

একটা অদ্ভুত রহস্যের মত ফোরটুয়েন্টি নামটার জন্যই আরও নানান্-খানা রটেছে। বিশেষ বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা তাকে চিনে উঠতে পারছে না। আর এ বস্তির মানুষগুলো সুযোগ বুঝে এমন সব কথা বাইরে রটিয়ে আসে যে, তাদের ফোরটুয়েন্টি একটা না জানি কি। এ মানুষটা যেন তাদের এক মস্ত গৌরব। গৌরববোধের জন্যই হয়তো রং মেশাবার আর হিসেব নেই। এ মামলায় হার হোক্ আর জিত হোক্, জমিদার যে কিছুটা থমকে গেছে এ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস সবাইকে খুশি করে তুলেছে। তারা বেশ বুক ঠুকেই বাইরে বলে আসে, জমিদারের থোতা মুখ ভোঁতা হতে আর বেশী দেরী নেই।

অন্যান্য বস্তির মালিকরা রীতিমত প্রচার শুরু করেছে, মাঠের ধারে বস্তিটা একটা চোর ডাকাতদের আস্তানা হয়ে উঠেছে। এ এলাকায় সমস্ত গাঁটকাটাদের ওটাই হল আড্ডাখানা।

এরই মাঝে তবু গোবিন্দ কয়েকবার পালিয়ে যাবার কথা ভেবেছে। কিন্তু তার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেই ওস্তাদ মিস্তিরি ছোকরা আজ অন্য পথে মেলে দিয়েছে নিজেকে। তার বেগটাও কম নয়। এই তো সেদিন এল, এরই মধ্যে সব জুটল বন্ধু, শত্রু গজাতেও রইল না বাকি। পুরনো পরিচয়ের সূত্র ধরে সে তার লেখাপড়া জানা বাবু বন্ধুদের কাছে গিয়েছে পরামর্শের জন্য, একটু সমঝে দেওয়ার জন্য তার গতি। তাছাড়া গণেশ তার পরিসর আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

দিনে দিনে, কোন্ ফাঁকে যে গোবিন্দ এ বস্তির সমস্ত কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তা বুঝি নিজেও জানে না। এখানকার দৈনন্দিন ঝগড়া বিবাদের সালিশী বল, বিচার বল গোবিন্দ না হলে জমে না। বিশেষ বাড়িওয়ালা ও গণেশের মত লোক যাকে রেয়াৎ করে, তাকে কি কখনো ছাড়িয়ে যাওয়া যায়।

কত সময় কত খবর আসে। এ মামলাটার জন্য প্রায়ই শাসানি আসে গোবিন্দের প্রতি মার খুন জেলের। কিন্তু গোবিন্দ বুঝি এটাকে গ্রহণ করেছে প্রাণের মূল্যেই।

এখানে আর সব কিছুর মধ্যে এ ব্যাপারটা তার ফাঁকা জীবনের অনেকখানি ভরে দিয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হয়, না, ভরেনি, ফাঁকের মুখটা যেন আরও বড় হয়ে গেছে। দিবানিশি এ শূন্য জীবনের জ্বালা সে কি দিয়ে যে ভরাট করবে, তা ভেবে পায় না।

তার চেহারাটা অনেকখানি ভেঙে গেছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি কেমন অসহায়, অনুসন্ধিৎসু, দিশেহারা। সে যেন কি চায়।···কী চায়? তা বুঝি নিজেই জানে না। শুধু একটি মুখ বারবার ভেসে ওঠে চোখের সামনে, আর ধিক্কারে ও লজ্জায় যেন মাথা নুয়ে আসে। সে মুখ মনে করে তার মত পুরুষের বুকেও যেন নিশ্বাস আটকে আসে।

জীবনের এ ফাঁকটা নিয়েই সে অষ্টপ্রহর এর ওর ঘরে ঢোকে, এর তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়, বাচ্চাদের কোলে করে রাখে, ফাই ফরমাস খাটে প্রায় সকলের।

এখন যে সে হাসছে রুগ্ন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে, তা যেন নির্ধন দরিদ্রের ধন পাওয়ার হাসি।

ওই যে নর্দমার ধারে কুন্দ ফুলের অপূর্ব সতেজ দুটি গুচ্ছ ফুটে রয়েছে, ওই গাছটি এনে পুঁতে দিয়েছিল গোবিন্দ। ছেলেটি ফুল বড় ভালবাসে। কিন্তু ফুল ফোটার কোন আশা ছিল না। কেননা, গাছটার উপর দৌরাত্ম্য তো কম হয়নি। ঘরে উঠতে গিয়ে অনেক সময় পায়ের তলায় চেপটে গেছে, ঘরের আর দুটো বাচ্চা তো একটি সবুজ পাতা গজাতে দেখলেই টুক্ করে ছিঁড়ে ফেলত।

এখন ছেলেটি সদা সতর্ক প্রহরীর মত সারা দিন বসে থাকে রকের ধারে ফুল গাছটার কাছে। একটা সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছে গাছটার গোড়ায় তার ফোরটুয়েণ্টি চাচা। ছেলেটা হাতে ধরে রাখে সুতো। চলৎশক্তিহীন বলে সে নামতে পারে না, অথচ নাগালও পায় না। তা ছাড়া কেউ ছুঁলেই সে টের পায়, যেন বৈদ্যুতিক শক্ লাগার মত।

এই এবড়োখেবড়ো উঠোনে, মেয়েদের কুড়িয়ে আনা গোবর, ছাই ঝাড়া কয়লা, ঘেঁষ এখানে সেখানে স্তূপীকৃত। মাটি চটা ছিঁটে বেড়া, বড় বড় ইঁদুরের গর্ত, জটিবুড়ির জটের মত খানে খানে ঝুল বেয়ে পড়েছে খোলার চালার গা থেকে।

তার মাঝে এ ফুলের গুচ্ছ দুটো যেন উড়ে এসে জুড়ে বসার মত একেবারে বেমানান।

ছেলেটার আহার নিদ্রা ভুলিয়েছে ওই ফুল দুটো, আজ ক-দিন ধরে এ ফুলের সঙ্গে কোথায় যেন মাকি সাহেবের সঙ্গে বিলেত যাওয়ার সুখী

ভবিষ্যতের যোগসূত্র আছে। শরীরটা তার আরও ভেঙে গেছে, গায়ের রংটা হলদে সবুজে মিলে নীল হয়ে উঠেছে। সমস্ত আয়ুটুকু এসে ঠেকেছে যেন চোখ দুটোতে। সেই চোখে অনুক্ষণ বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে আছে ফুল দুটোর দিকে। কারাপ্রাচীরের মত এর ঘরের বেষ্টনী পেরিয়ে দৈবাৎ যখন একটু হাওয়া নেমে আসে উঠোনে তখন একটু গন্ধ পাওয়ার জন্য নাকের পাটা ফুলিয়ে বুকের হাড় কাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

মধুলোভী ভোমরা আসে গুন্‌গুন্ করে তার সাত জন্মেও না আসা এ হতকুচ্ছিত জায়গায়।

বস্তির এ দুপুরের নৈঃশব্দ্যের সুযোগে সেই বুড়োটে গম্ভীর গলা নিজের সুরে বিভোর হয়ে গেছে। সে গানের পর গান গেয়ে চলেছে এক নাগাড়ে।

সম্‌সারেতে বাঁধা মন তোর, খুঁটোয় বাঁধা বলদ রে।
চোখে ঠুলি, গলায় দড়ি মনিষ্যি কাল কাটালি রে॥

এ একঘেয়ে গলার গান ছেলেটাকে আজ যেন আর ছুঁতে পারছে না। সে তার আপন মনে সুতো ধরে টানে, নড়েচড়ে ওঠে গাছটা। সেও আপন মনে দুলে দুলে হাসে আর কি যেন বলে ফিসফিস করে। গাছটা যেন তার সঙ্গী হয়ে গেছে।

মুহূর্তের জন্য সব ভুলে গোবিন্দও দুলতে আরম্ভ করে তার সঙ্গে। তার রোগা মুখে অদ্ভুত হাসি।

তার মধ্যবয়সী মা কাঁচা রকে শুয়ে আছে একেবারে খালি গায়ে। পাশে ঘুমন্ত পড়ে আছে আর দুটো বাচ্চা বেজির মত গায়ের রং নিয়ে। হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে এমনি ভাবে ছেলেটা ডাকল, মা রে, মা! মায়ের কোন সাড়া নেই।

ছেলেটা আপন মনেই কতগুলো অদ্ভুত দুর্বোধ্য ভাষা বলে উঠল।

গাছটার দিকে তাকিয়ে একটু সলজ্জ হেসে বলল, ইন্‌জিরি কথা বললাম।

সুতোতে একটা টান দিয়ে বলে, বিলেত যাবার সময় তোকেও নিয়ে যাব। ভোঁস্‌···ভোঁস্‌···কল্‌কল্‌··জাহাজটা এমনি করে যাবে। সুমুন্দুরের ঢেউ কি, আরে বাপ্‌রে! ডাকে কি রকম, ঐ···আ··· ঐ···আ। রহমত চাচা বলেছে।···আর সেখানে গঙ্গার ধারে মাকি সায়েবের বাগানে তোর মত অনেকে আছে, তাদের সঙ্গে তোকে রেখে দেব। ওই গাছগুলো তো সব মেম গাছ, তোর সঙ্গে বেশ বে হবে।

বলে সে হেসে উঠল যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। তারপর মায়ের পাশে কাত হয়ে একটা খোলা স্তন মুঠো করে ধরে ঠোঁটে নাকে চোখে ঘষতে লাগল আর ওঁক ওঠার মত করে যেন গলার শির টেনে চাপতে লাগল একটা বমির বেগ। এক একটা বেগ চাপতে গিয়ে পেটটা ঘোঁচ হয়ে পাঁজরের হাড়গুলো বনমানুষের হঠাৎ দাঁত খিঁচোনের মত বেরিয়ে পড়ছে। থেকে থেকে তার এমনি হয়। তারপর আপনিই সে ঘুমে ঢলে পড়ে।

তাতে তার মায়ের কোন ব্যাঘাত হল না ঘুমের। দাঁত বের করে সে তেমনি ঘুমিয়ে বোধ হয় তার ছেলের বিলেতে গিয়ে মিস্তিরি হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল।

হঠাৎ হাওয়ায় শিউরে উঠল কিশোরী কুন্দ গাছটা। এক ঝলক হালকা মিঠে গন্ধ কোথায় উধাও হয়ে গেল হাওয়ার সঙ্গে।

দুলারী হাসছে আড়ে আড়ে, টিপে টিপে। বস্তির বাইরের রকে বসে হাসছে। ওই কুন্দ ফুলের মতই তাজা হয়ে উঠছে সে। রং

লাগছে আবার তার শরীরের রেখায় রেখায়, কঙ্কালের গায়ে লেগেছে মাংস। সেরে উঠছে হুলারী।

কাছে বসে তার দিকে চেয়ে হাসছে গোবিন্দ। খানিকটা বোকাটে বিমুগ্ধতায় আচ্ছন্ন তার মুখ। বিগলিত চোখে জিজ্ঞাসা···কিন্তু শরীরটা তার ভেঙে পড়েছে অনেকখানি।

তুপুর গড়ায়। রাবিশ ফেলা রাস্তাটায় কতগুলো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কি সব কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সামনের ফালি মাঠটাতে ঝগড়া লেগে গেছে শালিকদের।

তুলারী আজ নতুন হয়েছে। সদী বুড়ি আজ নিজের হাতে তাকে নাইয়ে দিয়েছে গঙ্গার মাটি ঘষে, সারা গা সরষের তেল দিয়ে লেপে মুছে দিয়েছে, চুবচুবে মাথা আঁচড়ে দিয়েছে পাট করে। কপালে দিয়েছে মেটে সিঁতুরের তেল গোলা টিপ, কাজলের রেখা টেনে দিয়েছে চোখে। কানের বিলিতি রূপোর মাকড়ি, কঙ্কন, পায়ের বাঁকমল ছাই দিয়ে মেজে দিয়েছে ঝকঝকে করে। অনেক দিন বাদে নিজের হাতে হলুদ রংএর সাড়ী পরেছে নাভির তলা দিয়ে আঁট করে বেঁধে, বিনা কোঁচে, দোভাঁজে নিভাঁজ করে করে, যেমন করে সে কারখানায় যেত। কঙ্কালের সে মস্ত বড় বড় অসহ্য তীব্র চোখে আজ সলাজ হাসি, চোখের তারায় নতুন ধার।

গোবিন্দ বলল, কি, মিছে বললুম বুঝি?

তুলারী বলল, হট্! তোমার খালি দিল্লাগি।

বাঃ রঙ্গ করলে তোমরা, দিল্লাগি হল আমার?

তুলারী এবার খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। যেন রনরনিয়ে উঠল থম ধরা বস্তি। চমকে উঠল ঝগড়া ব্যস্ত শালিকের দল। বলল, আমি তো পড়েছিলাম বেমারিতে, রঙ্গ তো করেছে তোমার দোস্ত্।

গোবিন্দ গালে হাত দিয়ে বলল, বোঝ তা'লে, অমন একটা মানুষকে কি মস্তানটাই তুমি মজিয়েছ। তবে ব্যাপারটা আমি বুঝেছি।

কী বুঝেছ? ঠোঁট টিপে তাকায় দুলারী গোবিন্দের দিকে।

সে আর তোমাকে কি বলব দোস্তানি। গোবিন্দও এবার আড় চোখে তাকায়। বলে, আমি ছুতোর শালাই মজে গেছি।

হায় রাম···হায় রাম! বলে হাসিতে ঢলে পড়ে দুলারী। বলে, কেন, কেন?

গোবিন্দ বলে অপাঙ্গে তাকিয়ে, অমন যার রূপের বাহার!······

হাসতে হাসতে বার বার আঁচলের ঝাপটা মারে দুলারী গোবিন্দের গায়ে মাথায়, তুমি কী বেহায়া!

কিন্তু বেশীক্ষণ হাসতে পারে না দুলারী। অল্পেতেই হাঁপিয়ে ওঠে, কাশি পায়। চোখ বুজে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আচ্ছা, কেন এমন হয়? তোমার দোস্ত্ কি পাগল?

গোবিন্দ বলল, তা সে একরকমের পাগলই। ওরা যেটাকে ধরে, তার একটা গতি না করে সোয়াস্তি পায় না। ক্ষ্যাপা কি না! আমাকে যেদিন ওর প্রাণের কথা বললে, সেদিনে কী জোশ্। আসলে ওকে যারা ভালবাসে, তাদের সকলের জন্যই ও জান দিতে পারে। তাই তো বল্‌ছি, তোমরা দুজনেই আমাকে মজিয়েছ। কিন্তু দোস্তানি, এ ক্ষ্যাপামি নিয়ে সংসার চলে না।

দুলারী ত্রাসভরে বলে, তাই তো বলি দোস্ত্, কী তুক্ তোমার জানা আছে বল। এ সারা বস্তির তামাম মেয়ে পুরুষ ওকে ঘরের বার করতে পারেনি। ও বলত, শালা পয়সাতেও কুলিয়ে উঠতে পারিনে, ব্যামোও ছাড়ে না, কোন্‌দিন এসে দেখব, মরে পড়ে আছ। আর বেরুব না। আমার তো কোন তাগদ নেই। বাড়িওয়ালাকে থোড়াবহুত মানত, সেও হার মেনে গেল। আমি মরতে পারি, মগর

ওর জান যাবে, তাই ভেবে আমার মরণেও সুখ ছিল না। দোস্ত্‌…
তুমি সেদিনে না এলে…

গোবিন্দ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

দুলারী ছোট মেয়ের মত প্রায় আব্দার করে করে উঠল, যেও না।

গোবিন্দ কোমরে হাত দিয়ে বলল, বলবে তো যে, আমি একটা দেওতা?

না, তুমি সব। বলতে গিয়ে গলার স্বর গভীর হয়ে আসে, চোখে ঘনায় ছায়া। বলে, আদমির কাছে সরম করি, তুমি সেটুকুও যে লুটে নিয়েছ।

হাসতে গিয়ে কেমন বেকুব বনে যায় গোবিন্দ। খানিকক্ষণ থম্‌ ধরে থেকে তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে হো হো করে। বলে, তোমার খালি এক কথা।

এক কথা কেন? বেমারিতে তুমি যা করেছ, তা বুঝি মা-বাপও পারে না।

শুনেও গোবিন্দ কথা বলতে পারে না। তার বুকের মধ্যে যেন শিশুর দুর্বোধ্য কলকলানি, তাও শব্দহীন কথাহারা।

দুজনেই তারা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর আচমকা একটা নিশ্বাস ফেলে দুলারী বলে ওঠে, ক্ষ্যাপা!

কে?

তোমার দোস্ত।—বলতে বলতে তার মুখ থমথমিয়ে ওঠে, হাসন চোখে ফোটে দুশ্চিন্তা। বলে, ছাঁটাই আসছে আবার, দোস্ত তোমার ফের ক্ষেপে যাবে।

ক্ষেপবে কেন? খিলাফ লড়বে।

তা লড়ুক। মগর, আমি কারখানায় থাকলে ওকে নজরে রাখতে পারি।

চিরকাল তোমার নজরে তো থাকবে না।-

না থাকুক। যদ্দিন জিন্দা আছি, তদ্দিনই রাখব। দালালরা ওকে কত দফে মারার চেষ্টা করেছে, পারেনি আমার জন্তে।

সাথীরা তো আছে।

সাথীরা কতক্ষণ। যার হুঁশ নেই, সাথীরাই বা তার কি করবে, বল?

সত্যি, ছাঁটাই যেন চটকলে শরৎকালের মেঘের মত। কখন আসবে কখন যাবে আর কি তার কারণ বুঝতে না পেরে যেমন হঠাৎ ফ্যাসাদে বিব্রত মানুষে জানোয়ারে ছুটোছুটি আরম্ভ করে, ছাঁটাইয়ের আচমকা মারটাও আসে তেমনি।

গোবিন্দ বলে, তাই তো বলছি দোস্তানি, এ প্রাণ সুখ চায়, শান্তি চায়, চায় দিলঠাসা মহব্বত, কিন্তু জীবনের এক ধান্দাই যে সব শেষ করে দিয়েছে। সাঁতরে যদি না ডাঙায় উঠতে পারি, হাঁটব কোথা?

দুলারী বলে, সচ্‌...মগর দিল যে মানে না দোস্ত্‌!

দিল মানে না। গোবিন্দের মুখটা হঠাৎ কি রকম হয়ে যায়, একটা রুদ্ধ যন্ত্রণায় যেন তার মুখ স্ফীত হয়ে ওঠে। ওই একটি কথা জীবনের আর সব কিছুকে যেন মুহূর্তের জন্ত স্তব্ধ করে দিতে পারে। দিল মানে না। চকিতে যেন আকাশের বুকে মেশা দিগন্তবিসারী পথ তাকে আবার বিবাগীর বেশে ডাক দেয়। জীবনের এত ধান্দার পোড় খেয়ে আজ আবার হঠাৎ সব দিকে হৃৎপিণ্ড ক্ষইতে শুরু করেছে। বেপরোয়া প্রাণের দরজা খুলতেও ভয় হয়। ভবঘুরে প্রাণের আবার এত জড়াজড়ি না মানামানি কেন? আবার যেন মনটা পালাই পালাই করে।

পরমুহূর্তেই মনে হয়, পথেও যদি আবার প্রাণ না মানে। না মেনে তো চলে এল একবার। বেসরম প্রাণ!

বেসরম বৈ কি! নইলে আজ আবার কেন ছুতোর বউ ঘোমটা তুলে ইশারা করে, চোখে ভেসে ওঠে দরাজ উঠোনে মাটি মেখে খেলা করে

নাদুস নুদুস ছেলেমেয়ে, দু-হাত যেন তাদের সাপটে ধরতে চায় খালি বুকে।

দুলারীকে অবাক করে দিয়ে সে ভিতরে গিয়ে যে মুহূর্তে জল আনার টিনের বাঁকটা কাঁধে তোলে সেই মুহূর্তে গ্লানি ও বিরক্তিতে মনে হয় বাঁকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় কোথাও।

আজকাল তার এ কাজকে মনে হয় যেন একটা বিরাট অকাজের বোঝা। কাজের পটু হাতে যেন পুতুল খেলা। আবার কারখানার কাজ ধরবার জন্ত হাঁসফাঁস করে তার মন। শুধু তাই নয়। কারখানার কাজের শেষে ফিরে আসবে সে তার ঘরে। ঘরে থাকবে···

গণেশ-দুলারীর যুগল মূর্তি ভেসে ওঠে তার চোখে। অমনি অপরিসীম লজ্জায় ও জ্বালায় ভরে ওঠে তার বুক।

গোবিন্দ অবাক করেছে নিজেকে। অথচ তার এ মনই একদিন চেয়েছে, হেলাফেলায় কাটুক এ জীবন, মানুষের সঙ্গে থেকে, দশজনের মাঝে তাদের ফাইফরমাস খেটে, তাদের সুখ দুঃখের ওঠা নামায় দিন যাক কেটে।

কিন্তু সেদিন আজ বিস্বাদ হয়ে গেছে। এ জীবনে যেন কোন টান নেই, রং নেই, একেবারে পান্‌সে।

যে সুখ-দুঃখকে সে জীবনের পেছনে ফেলে রাখতে চেয়েছিল, বুঝি সেই সুখ-দুঃখ আজ আবার নতুন চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে।

মানুষ তার নিজের মনটাকে চিনতে পারে কতখানি। নিজের সঙ্গে যার বোঝাপড়া শেষ হয়নি, জগতের সঙ্গে তার বোঝাপড়া শেষ হবে কেমন করে। জগত বিচিত্র, কিন্তু মানুষের মন আরও বিচিত্র। বাঁকটা কাঁধে নিয়ে বেরুতে যাবে গোবিন্দ, এমন সময় আবার এসে দাঁড়াল দুলারী। মুখ তার গম্ভীর, থম্ থম্ করছে। সে এসে দাঁড়াল একেবারে গোবিন্দের কাছে, তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল তার মুখের দিকে।

গোবিন্দ অপ্রতিভের মত হেসে বলল, কি হল ?

পরিষ্কার গলায় বলল দুলারী, বহুত কুছ্। তোমার দিল ঠাসা আছে কিসে, কভি তা বলতে চাও না। ভাব, আমি কিছু সমঝি না। বল, কেন তুমি এমনি চলে এলে।

গোবিন্দ কাষ্ঠ হাসিতে খানিকক্ষণ হা হা করে তার স্বাভাবিক ঠাট্টার সুরে গেয়ে উঠল :

রঙ্গ করা স্বভাব যে মোর,
স্বভাব যায় না মলে,
যতই কেন বল না গো,
ইল্লত যায় না ধুলে।

তোমার সঙ্গে রঙ্গ করেছি।

এ কী রঙ্গ। তোমার মুখ হর বখত্ দুখ-আন্ধার।

দুলারীর নিশ্বাস লাগে গোবিন্দের গায়ে। গোবিন্দের চোখ বুজে আসে। আজ আর তাকানো যায় না দুলারীর দিকে। তার ভরা শরীর, নতুন পোশাক, উষ্ণ নিশ্বাস।

কান্নারুদ্ধ গলায় বলে দুলারী, বলতে, আমার ব্যামো সেরে গেলেই তুমি খুশি। সেরেছি। আর কি দুখ্ তোমার, বল আমাকে।

কি দুঃখ, সত্যি, কি দুঃখ গোবিন্দের ? রোগা মুখে তেমনি হাসির ঝলক ফুটিয়ে সে জবাব দিল, দোস্তানি দুঃখের কি শেষ আছে ? শেষ নেই। পথ ছাড়, কলে ভাঁজা লাগাতে হবে। অনেক কাজ রয়েছে।

আর একবারও দুলারীর দিকে না তাকিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল। কিন্তু বেরোবার গলির অন্ধকারে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দেওয়াল সেঁটে, যেন লুকিয়ে পড়েছে সে প্রাণঘাতী আততায়ীর ভয়ে। দু-হাতে মুখটা চেপে যেন অসহ্য ক্রোধে হিসিয়ে উঠল, এ শালা কিসে ফেঁসেছি আমি—কিসে ?

কেবল দুলারীর কাজল টানা চোখে ভিড় করে আসে মেঘ

আজকাল সে সবাইকে খেতে দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে খেঁকিয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, বিরক্তিতে হঠাৎ গালাগাল দিয়েও ওঠে। সেদিন হঠাৎ ঝগড়া লেগে গেল কি কারণে গোবিন্দের সঙ্গে সবাইকে খেতে দিতে গিয়ে।
যার সঙ্গে ঝগড়া লেগেছে, যত না চেঁচায় সে, তত চেঁচিয়ে খিস্তি করে গোবিন্দ।
সবাই অবাক হয়ে দেখে গোবিন্দকে। তার এমন ঝগড়াটে মূর্তি আর কোনদিন কেউ দেখেনি।
বাড়িওয়ালা হাঁকল, ফোরটুয়েন্টি!
কে কার কথা শোনে। সে তেমনি চেঁচাচ্ছে, শালা চোখ দিয়ে দেখে খা, কী দিয়েছি। বেশী বলবি তো ঝাড়ব রদ্দা।
কিন্তু রদ্দা ঝাড়াঝাড়ির আগেই বাড়িওয়ালা এসে গোবিন্দকে ধরে টেনে নিয়ে গেল রান্নাঘরের মধ্যে। বলল, জায়গার ব্যামো ধরেছে দেখছি।
গোবিন্দ ফুঁসে উঠল, তা মানুষের মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না, যা-ই বল।
কিন্তু আগে তো তুই এমন ছিলি না। স্নেহভরে বলল, শালা কী হয়েছে তোর?
কোন জবাব দেয় না গোবিন্দ। ঠাণ্ডা হয়ে আসে।
একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বাড়িওয়ালা বলে, মামলাটা বুঝি ফেঁসে যাচ্ছে? তাই তোর—
এবার গোবিন্দ হেসে উঠল তার স্বাভাবিক গলায়। এই সেরেছে। শালা দুনিয়ায় যে যার ভাবনা নিয়ে আছে। কে বললে তোমাকে এ কথা?

বাড়িওয়ালা তাড়াতাড়ি বলে, না, কেউ না। তোর গোমড়া মুখ দেখে তাই ভাবি। তোর কি হয়েছে বল্ তো ?

তোমার মাথা। বিরিজমোহন শালা এসে খচিয়ে গেছে বুঝি ?

অমনি বাড়িওয়ালাও ক্ষ্যাপাটে গলায় বলে ওঠে, হঁ্যা খচ্চরটা এসে আজ আমাকে বলে কি, তোমার ফোরটুয়েন্টিকে একবার দেখাও। হাঁকতুম শালাকে এক কোঁতকা—

তারপর শালা আর এট্টা মামলায় ফেঁসে জেলে যেতে, বলে, হা হা—হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল গোবিন্দ।

কোন কোনদিন দেখা যায় গণেশ অসম্ভব চেঁচামেচি শুরু করেছে কিংবা হঠাৎ দুলারীর ওই আধা রুগ্ন শরীরের উপরেই কষিয়েছে কয়েক ঘা। সেই তারই দুলারী বউ। সব সময় গণেশ তার পরিবেশের উর্ধ্বে নয়। একেকদিন বেধড়ক নেশা করে আসে। তা ছাড়া দুলারীরও এ বস্তিবন্দী মনটা আজকাল একটু খিটখিটে থাকে। বিশেষ করে দুরন্ত গণেশের বাইরের গতিবিধি তার ধরাছোঁয়ার বাইরে বলেই আরও দুশ্চিন্তায় মেজাজ তার বিগড়ে থাকে।

এ খিটিমিটির সময় গণেশ চেঁচিয়ে গোবিন্দকে ডাকে, দোস্ত্… ইধার আও।

গোবিন্দ গিয়ে দাঁড়ায় হেসে, কি হয়েছে ?

গণেশ সোজা বলে দুলারীকে দেখিয়ে, একে বাঁচিয়ে তুমি ভারী ফ্যাসাদ করেছ।

গোবিন্দ বলে, হঁ্যা, তাই তো। কি বলেছে ?

গণেশের গোঁফ জোড়া যেন সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে ওঠে, এ উল্লুক অওরত আমাকে বলে কি না, হরতাল কমিটির কাজে

তুমি এখন যানা-আনা কম কর, আমি আগে কলে যাই, তারপর ওসব হবে। সমঝো! ওর জন্তে আমি বসে থাকব?
গোবিন্দ কিছু বলার আগেই দুলারী সাপিনীর মত হিসিয়ে ওঠে। তার জলভরা চোখে ক্রোধ আর মুখের উপর এলিয়ে পড়া চুলে সে এক অপূর্ব রূপ। বলে, বলব, আমি লাখো বার বলব, তাতে ও মারার কে? আমার বেমারির টাইমে ও কেন ওর ওই খেঁচো মুখ নিয়ে ঘরে পড়েছিল বল? কোন্ অওরত আছে যার ভাবনা না হয়। একবার তেরো দিন হাজত হল, আমার নাওয়া খাওয়া নেই, সারা দিন হাজতের কাছে পড়ে থেকেছি। এসব পরেশানি কার?
গণেশও চেঁচায়, কারো ভাবতে হবে না। ফের বললে, মারব রন্দা—
মার না, মার। দুলারী পেছোয় না। বলে, গায়ে তাগদ থাকলে একবার দেখতাম।
তা ঠিক। দুলারী যখন সুস্থ ছিল, তখন গণেশের এরকম হঠাৎ ক্যাপামির দিনে—যখন দুলারীকে মারতে যেত, তখন সে এমন ছুটোছুটি করত যে, সারা বস্তিময় একটা হুল্লোড় পড়ে যেত তারপর আচমকা দুলারী উধাও হত। তখন গণেশ ঘরে ঘরে জিজ্ঞেস করত, দুলারী আছে এখানে?
সবাই বলত, না। আর ব্যাপারটাকে বেশ উপভোগ করত। কিন্তু এখন দুলারী সেটা পারে না।
তা ছাড়া এখন গোবিন্দকে পেয়ে ব্যাপারটার রং বদলেছে আজকাল।
গোবিন্দ বলে গম্ভীর হয়ে, দেখ দু-পক্ষেই জবাব আছে। তবে দোস্তানির এ আব্দারটা খুবই অন্যায্য।
দোস্তানির মুখ অমনি দুর্জয় অভিমানে থম্‌থমিয়ে ওঠে।
পরমুহূর্তেই গোবিন্দ কঠিন গলায় বলে, গণেশ, তুই শালা আর আমাকে

দোস্ত, বলিস্‌নে। বলি তোর দারু খাওয়া আর বউ ঠ্যাঙানোর কথাটা কি জানে হরতাল কমিটি?

জবাব দিতে গিয়ে গণেশ হাঁ হয়ে যায়। চুপসে যায় একেবারে গোঁফ জোড়া। চুপ করে থাকে সে।

গোবিন্দ বলে, জানে না তা'লে। আচ্ছা, ঠিক আছে।

গণেশ চোখ পিটপিট করে ডাকে, দোস্ত।

ফের ওই নাম? ধমকে ওঠে গোবিন্দ।

গণেশ গোবিন্দের হাতটা ধরে বলে, ক-জন সাথী মিলে পিলিয়ে দিয়েছে। দুলারী গালে জলের দাগ নিয়ে বিদ্রূপে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, ওকে খালি পিলিয়ে দেয়। পয়সা সবার সস্তা।

গণেশ তবু বলে, সচ বল্‌ছি দোস্ত, দলে পড়ে ঝট্‌সে পিয়ে নিয়েছি। ...আর নয়, কোনদিন আর যাব না।

গোবিন্দ জানত, এ ব্যাপারটাতে গণেশকে জোর দেওয়া মানে অন্য রকম করা। এটা দুলারীর কাজ আসলে। সে আরও তীব্র গলায় বলে, দোস্তানির গায়ে তোর হাতটা তো আর কেউ তুলে দেয়নিরে শালা! বলেছি না, অওরতের গায়ে যে হাত তোলে সে নীচের সঙ্গে আমি মিশিনে।

গণেশ চুপ করে থেকে খানিকক্ষণ ছটফট করে। হাত কচলায়, পা কচলায়, গোঁফ ঘষে, তারপর হঠাৎ বলে, দোস্ত্‌ সচ বলছি, মেজাজটা শালা বিলকুল কি রকম হয়ে যায়। কত ভাবি, তবু রুখতে পারি না। ও কেন আমার কাছ থেকে চলে যায় না?

তবু তুই নিজেকে রুখতে পারবি না? জলে ওঠে গোবিন্দ।

আর একটু চুপ করে থেকে বলে গণেশ, পারব আর যদি হাত তুলি তো এ শালার হাত আমি নিজেই কেটে ফেলব। ঠিক বলছি—

চট্ করে মুখ ফিরিয়ে বলে গোবিন্দ, তা আমাকে কেন বল্‌ছিস্? যাকে পিটেছিস্ তাকে বল্।

সে এক অদ্ভুত মুহূর্ত। গণেশ প্রায় মিনিটে এক পা করে এগোয় তুলারীর দিকে। কাছে গিয়ে ডাকে, এই···এই শোন্···

তুলারীর শরীর অমনি ফুলে ফুলে ওঠে কান্নায়। সে ঘোমটার আড়াল দিয়ে আড় হয়ে থাকে। গণেশ গায়ে হাত দিতেই ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

আর পিটব না, গোস্তাকি হয়েছে। সচ্···মাফ করে দে এবার। ভরাট হয়ে আসে গণেশের গলা।

তুলারী বলে অশ্রুরুদ্ধ গলায়, খালি বাতকে বাত।

না। সচ্···মরদ কি বাত্···

তুলারী বলে, ঝুট।

গণেশ বলে, না, সচ্······

তুলারী লুকিয়ে তাকায় গোবিন্দের দিকে। তার জলভরা চোখে হঠাৎ ঝিলিক দিয়েছে হাসি। গোবিন্দও টিপে টিপে হাসতে আরম্ভ করে। গণেশ তাদের তুজনের দিকে তাকিয়েই তুলারীর ঘোমটা টেনে খুলে ফেলে, আর তারা তিনজনেই হেসে ওঠে।

কেবল গোবিন্দের মুখটা কেমন বোকাটে হয়ে ওঠে আর তার হাসিটা যেন অতিরিক্ত চড়া গলায় বেস্থরো হো হো শব্দে ঘরটাকে কাঁপিয়ে দেয়।

ক-দিন ধরে বস্তিতে একমাত্র আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে ছাঁটাই। গান হাসি হল্লা সবই আছে, তবু এর মধ্যে ছাঁটাইয়ের কথাটা হয়ে উঠেছে মুখ্য।

কেউ বল্‌ছে, চারশো ছাঁটাই হবে। কেউ বলেছে, চার হাজার। কারো ধারণা, একেবারেই হবে না, ওটা গুজব! আবার কেউ বলছে, হবে, তবে এখন নয়, দেরী আছে।

একই সঙ্গে আর একটা সর্বনাশও ঘনিয়ে আসছিল, সেটা এ বস্তির মেয়াদ। মামলা চললেও মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। সেদিনের আর বেশী বাকি নেই।

সকলেই কিছু না কিছু বল্‌ছে এ সম্পর্কে কেবল পাশের সুদৃশ্য দোতলা বাড়িটা এ বস্তির গায়ে লেগে থেকেও যেমন এখানকার সব কিছু থেকেই আলাদা, ফুলকিও ঠিক তেমনি। ওই বাড়িটার রেডিও সংগীতের হঠাৎ রেশ ভেসে আসার মতই ফুলকির খিলখিল হাসি সবাই কান পেতে শোনে। সম্প্রতি তার প্রায়ই বাইরে রাত কাটে। আধিক্য ঘটেছে পোশাকের। সমস্ত জেনানা বহুড়ির দল হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার সাজগোজ। পুরুষেরা মুগ্ধ হয়ে দেখে তার হেলে দুলে চলন।

যখন সবাই কোন কথাবার্তায় মগ্ন থাকে, তখন ফুলকি এলেই তারা একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ফুলকি অমনি বাঁকা হেসে, একটা দোলন দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলে যায়।

কিন্তু কেউ বিশেষ কিছু বলে না, কয়েকজন ছাড়া। সে কয়েকজন তার সঙ্গে একই কলে কাজ করে। তাদের মধ্যে নগেন একজন।

এ বস্তির সকলেই প্রায় ফুলকিকে ভালবাসে, স্নেহ করে। পাঁচ বছর আগে একদিন অচেনা ফুলকি একটা কালো কঙ্কালের মত এখানে ধুঁকতে ধুঁকতে এসেছিল। অনেক কথা সেদিন বলেছিল সে যে, তাকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বিনা ইলাজে। তার একটা বাচ্চা মারা গেছে……।

কিন্তু কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। কেন হাসপাতাল, কার বাচ্চা, সোয়ামী কোথায়, কিছুই না। তার অবস্থা দেখে সবাই তাকে চাঁদা করে সাহায্য করেছে, ঘর দিয়েছে বাড়িওয়ালা, নগেন দিয়েছে চাকরি যোগাড় করে।

এরকম একটা মেয়ে একলা থাকলে যা হয়, সকলেরই নজরটা ঘোরে তার আশেপাশে।

এর দিলে রং লাগে, ওর চোখে লাগে নেশা।

কালো অবশ্য গোবিন্দকে এসব কথা বলেনি। অন্য সবার মুখে শুনেছে। কিন্তু ফুলকি নির্বিকার। সকলে ভাবে, বেওয়ারিশ হলেও একটা খাঁটি অওরত।

কেবল আশা ছাড়েনি কালো। তার বার বার ঘরভাঙা প্রাণের খোলা দরজা দিয়ে অষ্টপ্রহর উঁকি মেরে আছে একটা বোবা ভক্ত। সে আছে ছায়ার মত ফুলকির পিছে পিছে।

নগেনের গোবিন্দের প্রতি কটূক্তির পর কালো নিজে হাতে আজ পর্যন্ত রোজ ফুলকির ভাত নিয়ে যায়। কোন কোনদিন সকালে ফুলকিকে ঘরে না পেলে সেই ভাতগুলো সে ধরে দেয় ওই রুগ্ন ছেলেটির মধ্যবয়সী মাকে!

আগে সে গোবিন্দকে অনেক কথা বলেছে, সম্প্রতি আর বলে না। এমন কি বাড়িওয়ালার দৈনন্দিন গাঁজার আড্ডায়ও আজকাল আর তাকে দেখা যায় না।

গোবিন্দ ভালবাসে কালোকে। দিনে দিনে কালোর এ অবস্থা দেখে ফুলকির প্রতি তার রাগটা ঘৃণায় পরিণত হচ্ছিল। সে ডেকে কালোকে একদিন জিজ্ঞেস করবে ভেবেছে, কিন্তু সে সুযোগ আসেনি। তার মাথায় অষ্টপ্রহর এক ভাবনা ও উকিলের ঘর দৌড়নোও বেড়ে গেছে। কালোকেও সময়মত পাওয়া বড় কঠিন।

শীতের রাত।

রকের ধারে ধারে একটা করে চটের ঢাকনা দিয়েছে সকলেই শীত আটকাবার জন্ম। আকাশের পাতলা কুয়াশায় আর ধোঁয়ায় সব আচ্ছন্ন। দশটা না বাজতে সবাই ঘরে ঢুকে পড়েছে।

শুধু একটানা মাতাল গলায় চিৎকার করছে সেই রুগ্ন ছেলেটার বাপ।

কুন্দ ফুলের গাছটা ফুলহীন, পাতাহীন। ছেলেটা আজকাল বেশীর ভাগ সময় ঘরের মধ্যেই থাকে।

গোবিন্দ তার রান্না সেরে ঘুরে এসেছে উকিলের ঘর।

এমন সময় কালো এল। গোবিন্দ একবার দেখে মুখ ফেরাতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল। দেখল কালোর চোখ শুদ্ধ কপালের একটা পাশ ফুলে উঠেছে, চোখের কোলে খানিকটা কাটা দাগ। গোবিন্দ বলল, কি হয়েছে কালো?

নিরুত্তরে কালো একটা থালা হাতে তুলে নিল। ওই থালাটায় সে রোজ ফুলকির ভাত নেয়।

কালো! গোবিন্দ কাছে এসে ডাকল।

বল!

কে মেরেছে তোকে?

কালো মুখ ফিরিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল, ফুলকি।

কেন?

সে কথার জবাব না দিয়ে কালো বলল, ভাত দেও।

কিন্তু গোবিন্দের সমস্ত শরীরটা যেন শক্ত হয়ে উঠল। মনে হল কালোকেই বুঝি সে দু-ঘা কষাবে।

বলল, তবু শালা তুই—

ফোরটুয়েন্টি! ডেকেই থেমে গেল কালো, একটু চুপ থেকে বলল, এইটাই শেষ,···আর একবার···

গোবিন্দ চাপা গলায় উৎকন্ঠিত হয়ে বলল, শালা মরে যাবি যে! জান কি এতই সস্তা! কালোর হাসিহীন ঠোঁটের ফাঁকে অকালের ফোকলা মাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

মুহুর্তের মধ্যে গোবিন্দের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। অনেক দিন পর সে কালোর হাত ধরে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। এততেও জানটা কালোর কাছে দামী রয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে যখন সবাই নানান জটলায় ব্যস্ত, তখন হঠাৎ নগেন এসে রান্নাঘরের কাছে বসে থাকা গোবিন্দের ঘাড়ে হাত দিয়ে ডাকল, ফোরটুয়েন্টি।

গোবিন্দ আজকাল কাজ ছাড়া বসে থাকলেই কেমন চিন্তাচ্ছন্ন থাকে। নগেনের ডাকে সে বিস্মিত হল। কারণ সেই রাত্রের পর থেকে আজ অবধি নগেনের সঙ্গে তার কথা নেই।

নগেন বলল, বাব্বা, তোমার গোসা যে আর কাটে না দেখছি।

নগেনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল গোবিন্দ। যত দোষ সব ফোরটুয়েন্টি শালার। তুমি বুঝি রোজই কথা বলতে আস?

কথা টথা বল না, তাই বলছি। নগেন বলল।

নগেনের গলা এত মিষ্টি হতে পারে, গোবিন্দ ভাবতে পারেনি। নগেনের চোখ লাল ও আধবোজা। তার বেঁটে শক্ত শরীরে ক্লান্তির এলানো ভাব।

গোবিন্দ বলল, কি নগেন, ছাঁটাই শুরু হয়ে গেছে?

এখনো নয়। যেন খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলে নগেন একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, সেবারে সেই রাতে তুমি ভেবেছিলে আমি ফুলকিকে মহব্বত পেশ করতে যাচ্ছি, অ্যাঁ?

বলে সে একটানা জলের কল্‌কল্‌ শব্দের মত তাড়াতাড়ি বলে গেল ফুলকির সমস্ত কাহিনী। তার আসা থেকে শুরু করে সব। নগেন তার জন্য কত করেছে। অবশ্য একলা নয়, অনেকেই করেছে তবু নগেনকে ফুলকিই নিজে বলেছে, তুমি আমার যা করেছ, নিজের আদমিও তা কোনদিন পারে না। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। কিন্তু এ রকম কথা সে সারা বস্তির মরদদেরই বলেছে, যে জন্য সবাই তাকে নাম দিয়েছে প্রেমযোগিনী। কিন্তু···

নগেনের মুখটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। বলল, জানো ফোরটুয়েণ্টি আমাদের ছিপিয়ে ও অনেক দিন আমাদের লিবারবাবুর রেণ্ডিগিরি করে আসছে। হারামজাদী ভাবে, আমরা সে সব জানি না। কিন্তু কোনদিন কিছু দেখিনি বলে কিছু বলিনি। রাতে আমি রোজ খোঁজ নিতুম ও ঘরে ফিরেছে কি না। আর আজকাল ও আমাদের সেল্‌ সায়েবের কোঠিতে রাত কাটায়। আমি নিজে যেতে দেখেছি··· সচ,—সেল সায়েবের মেম বিলেত গেছে, এও জানি।···

ঝুট বাত। হঠাৎ কে বলে উঠল পাশের অন্ধকার কোল থেকে।

চমকে নগেন ও গোবিন্দ দেখল কাছেই দাঁড়িয়ে আছে কালো।

চকিতে নগেন একটা ভাল্লুকের মত লাফ দিয়ে উঠল, ঝুট বাত। বলেই জোড়া হাতের রদ্দা কষাল সে কালোকে, শালা ভেড়ো কাঁহিকা। অপ্রস্তুত কালো ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে রকের কোলে নর্দমার পাঁকে একেবারে নেয়ে উঠল। তার মূর্তি ও দুর্গন্ধে সে বিশ্রী ব্যাপার। তার উপরে এই অসহ্য শীতে কেমন কাঁপন ধরে গেছে তার। সমস্ত বস্তি হৈ হৈ করে ছুটে এল।

শালা মহব্বত দেখাতে এসেছে? ঝুট বল্‌ছি আমি? বলে নগেন আবার কালোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে গোবিন্দ তাকে শক্ত হাতে ধরে ফেলল।

তবু নগেন তড়পাতে লাগল, পুছ্ শালা, কে না জানে তোর ফুলকি সেল সায়েবের কোঠিতে যায়। পুছ্, কমিনা!
অনেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল,...আমি জানি।...আমি দেখেছি।...
এ রকম গণ্ডগোল হলেই মাদারি খেলওয়ালা তার ডুগডুগিটা বাজাতে আরম্ভ করে। আর চিৎকার করতে থাকে, ইস্টাপ্, ইস্টাপ্, ডোন্ট হট্, তব্ ফট্ হো যায়েগা। মাই—অ—ড—র!...
নির্বিকার শুধু সেই রুগ্ন ছেলেটি, তার মা। তারা আছে তাদের নিজেদের কথায় মগ্ন। আর নির্বিকার সেই দেহতত্ত্বের বুড়ো গায়ক।
গণেশ তখনো আসেনি। দুলারী এসে তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় গোবিন্দের পাশে।
ঠিক এই মুহূর্তেই ফুলকি ঢোকে বস্তির উঠোনে।
একটা নাটকীয় মুহূর্তের মত হঠাৎ সবাই চুপ হয়ে যায়। ফুলকি এক লহমায় সব দেখে আবার ফিরে একেবারে বস্তির বাইরে চলে যায়। যেতে যেতে তার আঁট করে পরা সাড়ী উড়িয়ে, টিপ ঝিলিক দিয়ে, বাঁকা হেসে আগুন ছড়িয়ে যায়। আশ্চর্য! মানুষগুলো যেন বোকা বনে যায় সব।
এ স্তব্ধতার মধ্যে ছেদ পড়ল মাদারি খেলোয়াড়ের চড়া গলায়, ত্মাটাজ কোল্ মাদারি খেল্। দি হুরী ইজ্ ফুড়ুক। ফোরটুয়েন্টি, খানা লাও!
আবার একটা শুল্তানি উঠল, কিন্তু জোরে নয়। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব।
কেবল কালো পাঁক মাখা গায়ে ফুলকিকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। সমস্ত উঠোনটা একটা নাটকীয় মুহূর্তের মত থম্‌কে রইল।

নোলক কাঁপিয়ে হাসছে লোটন বউ। তার কাছে বসে হাসছে নন্দ

আর হরিশ। অন্যান্য দিন তাদের ব্যাপার নিয়ে এ সময়ে সবাই হাসা-হাসি করে। আজ তারা হাসছে।

হাসতে হাসতে বলল লোটন বউ, মাগীটা ছেনাল!

বলে কাছেই পিচ্ করে এক গাদা থুতু ফেলে সে খেতে দিল নন্দ হরিশকে। লোটন বউ পোয়াতী হয়েছে। সেজন্য তোয়াজের অন্ত নেই নন্দ-হরিশের। আজ এ এটা আনে, কাল সে ওটা আনে।

চেহারা ফিরেছে লোটন বউয়েরও। মাংস লেগেছে তার লম্বা চেহারায়। হঠাৎ মনে হয় একটা রূপসী রাজপুতানি।

তার পেটে সন্তান আসার পর থেকে নন্দ-হরিশের ঝগড়ার বহরটা আগের থেকে অনেক পরিমাণে কমে এসেছে। লোকের সমস্ত ধিক্কার বিদ্রূপ সয়েও মনে হয়, তারা তিনজনে সুখেই আছে। পোয়াতী হবার পর একদিন আত্মীয় স্বজনেরা ওদের ছেঁকে ধরেছিল। কিন্তু একটা ভোজ দিতে তারা সবাই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে।

এখানে কেউই প্রায় ওদের সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। কিন্তু গোবিন্দ বলে। লোটন বউ যত দূর দূর করেছে, গোবিন্দ তত নাছোড়-বান্দার মত কাছে গেছে।

তারপর একদিন লোটন বউ বলেছে, বলছে গোবিন্দকে নিজেদের দোস্ত্ ভেবেই, এখানে কেউ আমাদের দেখতে পারে না। আমাদের ঘর ভেঙে দিতে চায় সবাই।

গোবিন্দ বলেছে, একি রকম ধারার ঘর। তুমি কি সুখে আছ।

সে বলেছে, এ দুনিয়ার সুখ দুখ কি জানি না, খালি ওরা দুটোতে বিবাদ না করলেই আমার সুখ।

গোবিন্দ প্রথমটা একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল কিন্তু আর সকলের সঙ্গে সেও এ ব্যাপারে এখন বিস্মিত হয় না আর।

কেবল নন্দ-হরিশের মারামারির সময় বাড়িওয়ালা যখন ওদের পিটতে

যায় তখন গোবিন্দ তাকে বাধা দেয়। সে দেখেছে লোটন বউ দরজা বন্ধ করলেই ওরা থেমে যায়।

কিন্তু লোটন বউ পোয়াতী হওয়ার পর থেকে যেন সুখের দশা লেগেছে। নন্দ-হরিশ যেন কোন্ নতুন জগতে বন্ধনের সন্ধান পেয়েছে।

ছাঁটাই!

সন্ধ্যাবেলা সমস্ত বস্তিতে হট্টগোল। একদল গান জুড়েছে সীতার বনবাসের, কোন্ ঘরে সব ভোলা রসিকের হারমোনিয়ামের পোঁ পোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে, কোন কোন দল নিছক গল্পে জমেছে। নর্দমার ধারের কোল আঁধারে ঘাপটি মেরে বসেছে কয়েকটা বাচ্চা।

এরই মধ্যে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে একটা বৈঠক ডেকেছে গণেশ। সেখানে বসেছে অনেকে। এ বৈঠক প্রায় প্রত্যহের ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে এ বৈঠকে গোবিন্দ আসে। কথাও বলে। এবং তার কথা আরম্ভ হলে দেখা যায়, অনেকে সেদিকে ঝুঁকে পড়েছে। গণেশ কিছুটা বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করে। কোন কোন সময় নিজেই গোবিন্দকে বেমক্কা প্রশ্ন করে বসে।

গোবিন্দ হটে না, প্রত্যেকটি কথার সে এমন জবাব দেয় যে, এর পরে আর কোন কথা ওঠে না।

দুলারী এ বৈঠকে প্রত্যহের একজন। সে কতখানি শোনে জানি না, গণেশ আর গোবিন্দের দিকেই তার নজর পড়ে থাকে।

গণেশ কিছু উত্তপ্ত, গোবিন্দ ঠাণ্ডা। গোবিন্দের আলোচনায় একটা ঘরোয়া সুর আছে। কিন্তু গণেশের কথায় ক্রোধ বেশী। সে নাগালের বাইরে, গোবিন্দ কাছে।

গণেশ গোবিন্দকে ধরে ধরে বাইরে অন্যান্য এলাকায় নিয়ে যায়। পরিচয়

করিয়ে দেয় তার অন্যান্ত বন্ধুদের সঙ্গে। তাদের দলের মধ্যেও এ ফোরটুয়েণ্টির খাতির বেড়ে উঠেছে আজকাল। বিশেষ গোবিন্দ তাদের অনেক আগের চেনা মানুষ।

আজকের বৈঠকটা সবে বসেছে, এমন সময় নগেন এল প্রায় একটা ক্রুদ্ধ মোষের মত ফুঁসতে ফুঁসতে। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন।

নগেন কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা গোবিন্দের কাছে গিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, ফোরটুয়েণ্টি, সেল সায়েব শূয়োরের বাচ্চা আজ আমাকে শাসিয়েছে, সে নাকি আমাকে কোতল করবে। আমি জানের পরোয়া করি না, কোতলের ভয় করি?

বলতে বলতে তার রক্তচক্ষু জ্বলে উঠল। সবাই এসে ভিড় করল সেখানে।

নগেন প্রায় কান্নার মত করে চেঁচিয়ে উঠল, ফুলকির জার সেল সাহেব আমাকে পাছায় জুতোর ঠোক্কর মেরেছে। আর এই ফুলকিকে আমরা—

বন্ধ হয়ে গেল তার গলার স্বর। তবুও বলল ফিস্ ফিস্ করে, সকলের সামনে ফুলকি আমাকে বলে কিনা, কুকুরের আবার খাসির গোস্ত্ খাওয়ার নোলা।

ঠিক এ সময়েই ফুলকি ঢুকল হেলে দুলে। পিছনে তার কালো।

ফুলকির দুঃসাহস ও বেহায়পনা এতই উগ্র যে, নগেনকে অপমান করেও সে আবার এখানে স্বাভাবিকভাবে এসে ঢুকেছে।

এক রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। চকিতে নগেন প্রায় একটা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ফুলকির উপর। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে।

পরমুহূর্তে দেখা গেল ফুলকি একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় ছুটোছুটি করছে, চিৎকার করছে ডাক ছেড়ে। আর তাকে ঘিরে রয়েছে যেন একদল বন্য উন্মাদ ক্ষ্যাপার দল।

নগেন তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে চিৎকার করে উঠল, দেখা সবাইকে, সেল মায়েবের কাছে বিকোনো চেহারাটা সবাইকে দেখা।

হঠাৎ কে পাঁক ছুঁড়ে দিল এক গাদা ফুলকির গায়ে, কেউ ধুলো, কেউ শুধু জল। জলার পত্নীর মত দেখাচ্ছে ফুলকিকে।

নানান গলায় চিৎকার উঠছে, আমার পয়সা ও খেয়েছে। আমি না খেয়ে ওকে দিয়েছি।

আমি নিজের গাঁট থেকে ওকে দাবাই এনে দিয়েছি।

কেউ কেউ ফুলকির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম করে করে সমালোচনা করছে।

আশ্চর্য! এতদিন এত রাগ কোথায় পোষা ছিল।

পাশের দোতলা বাড়িটার জানলায় উঁকি মেরেছে অনেকগুলো মুখ। হাসছে সব খিলখিল করে। শিশু গলায় চিৎকার ভেসে এল, একটা ল্যাংটো পাগলি রে!

গোবিন্দ একেবারে স্থাণুর মত, স্পন্দনহীন। কি যে ঘটেছে সে যেন বুঝতেই পারেনি। যে মুহূর্তে সে সম্বিৎ ফিরে পেল, সেই মুহূর্তে সমস্ত গোলমালকে ছাপিয়ে গলা ফাটিয়ে গর্জে উঠল, নগেন!

উঠোনের সবাই চমকে তার দিকে ফিরে তাকাল।

গোবিন্দ ছুটে এসে বলল, ফুলকি ঘরে যা।

সুযোগ পেয়েই ফুলকি লহমায় ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চেঁচাতে লাগল একটানা নাকি গলায়।

গোবিন্দের এই মুহূর্তের মত চেহারা বুঝি কেউ কোনদিন দেখেনি। নিষ্ঠুর, জলন্ত একটা মস্ত কয়লার ড্যালা যেন। নগেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, শালা দুনিয়াভর তো রেণ্ডি আছে, সে সবার পয়সায় খায়। তুই বাড়িওয়ালাকে বললি না কেন ওকে তাড়িয়ে দিতে?

বলেই সে আচমকা একটা ঘুষি বসিয়ে দিল নগেনের চোয়ালে। নগেন

হতভম্ব, অত বড় যোয়ানটা সন্ত্রস্ত। ঠোঁটের কষে রক্ত দেখা দিল তার। তোদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যে শালা ফুর্তি করে গেল সায়ের তাকে ক-দিন এ রাগ দেখিয়েছিস্? কুকুরের পেছনে তুইও কুকুর হবি? বলে সে আবার নগেনের চোখে মুখে উপর্যুপরি কষাল কতগুলি সাংঘাতিক ঘুষি।—শালা, বড় হাত চালাতে শিখেছিস্?

গণেশ এসে দু-হাতে জাপটে ধরল গোবিন্দকে। দোস্ত কী করছ?

বাড়িওয়ালা ডাকল, ফোরটুয়েন্টি!

নগেন হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, হাঁ আমাকে মেরে ফেল,—খুন করে ফেল,···বরবাদ করে দেও!

একটা প্রেতপুরীর নিস্তব্ধতা যেন নেমে এসেছে। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত চোখে গোবিন্দকে দেখছে।

বাড়িওয়ালার দিকে ফিরে বলল গোবিন্দ, এখুনি তুমি হুকুম কর ফুলকিকে বেরিয়ে যেতে।

হুকুমের আগেই কাপড় পরে বেরিয়ে এল ফুলকি। আহা, কোথায় সাজগোজ, কোথায় বা অত দোলানি। ফুলকির মুখ যে এত কুৎসিত হতে পারে, এখন না দেখলে বোঝা যায় না। চোখে তার জল নেই, গজরাচ্ছে সে, আমি নিজেই যাচ্ছি, কারো পরোয়া করি না। এর শোধ যদি না তুলি, তোদের যদি না আমি সজুত করি তো আমি কুত্তিরও অধম।

গোবিন্দ তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার পেছনে কালোও গেল বেরিয়ে, ধীরে—মাথা নীচু করে।

কি রকম নিঝুম হয়ে গিয়েছে সারা বস্তিটা। এখানে সেখানে লম্প আর কেঁসোর দলা জলছে টিম্ টিম্ করে। বাড়িওয়ালা আর গণেশ নগেনকে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে বসেছে তার পাশে।

গোবিন্দ যন্ত্রের মত রান্নাঘরে রুটি সেঁকে চলেছে। উনুনের গন্‌গনে আঁচে তার ঘর্মাক্ত শরীরটা রক্তের মত লাল হয়ে উঠেছে। অন্যান্য দিনের মত এসময়ে আজ কারো খেতে চাওয়ার তাড়া আসছে না।

রুগ্ন ছেলেটা নীল শরীরে বসে আছে রকে। তার গলার স্বর আজকাল বন্ধ হয়ে আসছে। সুতো বাঁধা সেই কুন্দ গাছটায় ফুল নেই, পাতা নেই, ঝাড়ুর কাটির মত রয়েছে দাঁড়িয়ে। তার মাতাল বাবা ঘরের মেঝেয় শুয়ে আছে, নেশার ঝোঁকে গুটিশুটি হয়ে।

সেই বুড়োটে গম্ভীর গলা আজ গানের মত করে বলছে :

দুনিয়ার সব জায়গা থেকে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে এলে ঠাকুর, সবাই বললে, সবখানেই তোমাকে পাওয়া যায়, কিন্তু আজও তো তোমাকে পেলুম না!

মাদারি খেলওয়ালা তার ডুগডুগিটার চামড়ায় থুতু দিচ্ছে, ঘষছে আর বিড়্‌বিড়্‌ করছে, দিসিস্‌ ব্যাড্‌, অল্‌শালা খচ্চর।···ফুল, ইস্টাপেড্‌···। তারপরেই একটা ঢোঁক গিলে বলে ওঠে নিস্তেজ গলায়, কখন যে খেতে দেবে!···

রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দুলারী। গোবিন্দ একবার ফিরে দেখল, কিছু বলল না।

দুলারী হঠাৎ অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলে উঠল, এ দুখভোর জিন্দিগীতে যাদের কাছে গেছি তারা সবাই এমনি,···তুফানের আগে তারা ছোটে, জান নিয়ে হোলি খেলে। আমার ঘর তোড়ফোড়, জান চৌপাট তবু তারা বিপদের পথ ছাড়বে না। কাহে···কাহে?

তার ঘরভরানোর সব আশা গণেশ ধূলিসাৎ করেছে, আর আজ গোবিন্দের মত দোস্তকে সেই একই পথের শরিক দেখে কান্না মানছে না দুলারীর।

গোবিন্দ তবুও নির্বাক। কেবল খানকয়েক রুটি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল।

রাত্রি কত ঠিক নেই। চারদিক স্তব্ধ, অন্ধকার।

হঠাৎ নগেন জেগে গেল। কে যেন তার গায়ে মুখে আস্তে আস্তে হাত বুলাচ্ছে। তার সারা মুখে ব্যথা, ফুলে গেছে।

কে?

একটুখানি নীরব, তারপর শোনা গেল, আমি, ফোরটুয়েন্টি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথা শোনা গেল না। দুটো বলিষ্ঠ বুকেই বুঝি নিশ্বাস একেবারে আটকে গেছে। নিথর নিকষ কালো রাত্রি। বোবা পৃথিবীর তলায় যেন শুধু জলের কল্‌কল্‌ শব্দ।

নগেনের মুখের উপর রাখা হাতটা ভিজে গেল গোবিন্দের। সে ডাকতে গেল নগেনকে, স্বর ফুটল না। একটু পরে আবার বলল, নগেন··· আমাকে মাপ কর ভাই।···

নগেন দু-হাতে গোবিন্দের হাতটা চেপে ধরে একেবারে ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে উঠল। গোবিন্দের হৃৎপিণ্ডটা ফুলে উঠল ফানুসের মত

অনেকক্ষণ পর নগেন বলল, তোমাকে মাপ করবার মত কেউ জন্মায়নি। তুমি আমাকে আজ বাঁচিয়েছ। বলে সে একটু চুপ করে থেকে আবার বলল ভাঙা গলায়, তুমি না থাকলে আজ আমি না জানি কি করতাম।···হয়তো সকলের সামনে···আমি ওকে···। হ্যাঁ, আমি তখন একটা রোখা কুত্তারও অধম হয়ে গেছ্‌লাম। ফোরটুয়েন্টি··· আমরা জানোয়ার একেবারে জানোয়ার।

জানোয়ার! খানিকক্ষণ চুপ থেকে গোবিন্দের মোটা গলায় একঘেয়ে

স্বরে শোনা গেল, ঘর নেই, দেশ নেই, শরীলটাও শালা বুঝি আপনার নয়। জানোয়ার আমরা।

বলে একমুহূর্ত চুপ করে থেকে সে হঠাৎ তীব্র চাপা গলায় বলে উঠল, কিন্তু এ শালা আইনটা কোথাকার? আমরা কি ভালো হতে পারিনে? তোকে মারলুম কেন? না, তুই ফুলকিকে মারলি। তাতে কি হবে? কালকেই আবার সেল সায়েব শালা ওকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবে, ও এসে আবার আমাদেরই দলে ভিড়বে। এখানে না হোক্ অন্যখানে। তখন? তাতে আমাদের কি ভালোটা হল। আর সেল সায়েবের জুতোর ঠোক্করই বা বন্ধ হল কোথা? আমরা যদি খেয়োখেয়ি করি, আমাদের ব্যবস্থা করবে কে? নাকি, জম্মোটা শালা ফালতু দিয়েছিস বাপ মা?

নগেনের মার খাওয়া ফোলা মুখটা অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। ফুলো মাংসের ভিতরে তার চোখ দুটো যেন নবজাত শিশুর চোখের মত উজ্জ্বল। তার সে চোখের দৃষ্টি গোবিন্দের সারা মুখে কি যেন খুঁজছে আঁতিপাঁতি করে।

গোবিন্দ যেন বাপের মত নগেনের দিকে আরও খানিক ঝুঁকে পড়ে বলল, মহামারী আসে মারতে, আমরা তাকে তাড়াই, মারতে আসে ঝড় আমরা ঘর বানাই আর এ জীবনটাকে পারি না মন্দ থেকে ভালো করতে? অনিয়মের নিয়ম চাই, এ সোজা কথাই বুঝি। মার তো খাচ্ছিই পড়ে পড়ে, আবার নিজেরাও মারামারি করব?

না। শুধু এই একটি কথা বলে স্তব্ধ হয়ে গেল নগেন।

রাত্রি পুইয়ে আসছে। পাশের বাড়িটার কলের জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গ্রীষ্মের ছোট রাতের অন্ধকার কেটে ফুটছে আলো।

দেখা গেল বাড়িওয়ালা কখন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে। বলল, ফোরটুয়েণ্টি, এদিকে আয়।

কিন্তু গোবিন্দের মুখে কোন কথা নেই, অনড়, নিশ্চল। কি এক ভাবে যেন সে বিভোর হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল উঠোনের দিকে। সেই বুড়োটে গলায় যেন আপ্‌সোসের সুর ফুঠল:

তবে কি গো দেখা হবে,

ভবের খেলা সাঙ্গ যবে—?

ছাঁটাই!······সামাল! ঝড় এসেছে!··

দুপুরের খাবার সময়ে কেউ খেতে এল না। যে দু-একজন এল, তারা খেতে পারল না। সময় নেই, হারজিতের লড়াই লেগেছে। সেখানে চারদিকে পুলিসের বেষ্টনী, ভিতরে অভ্রভেদী ঘেরাওয়ের ব্যূহ। এতদিনের সমস্ত প্রস্তুতির পরীক্ষার ফল হাতে নাতে নিয়ে ফিরতে হবে। সমস্ত সংশয়ের মাথায় বাড়ি দিয়ে সে এসেছে। লৌহ ঘেরাও মাথা তুলেছে সংশয়হীন।

কারখানার থমথমানি বস্তিতে এসে পড়েছে। সমস্ত বস্তিটা যেন প্রতীক্ষা করে আছে ঝিম্ মেরে। বাড়ির ওপারে রাবিশ ফেলা রাস্তাটা আজ ফাঁকা, কর্ড রোডের ধারে গাছগুলো স্তব্ধ। আকাশ গুমোট।

বাড়িওয়ালা খানিক বসে আর খাটিয়া এপাশ ওপাশ করে। গোঁফ মোচড়ায় আর বি, টি, রোডের বুকে মিশে যাওয়া রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

গোবিন্দ রান্নার ফাঁকেই উধাও হয়ে যাচ্ছে, আর ফিরে ফিরে আসছে। দুলারী ছুটে ছুটে বাইরে যায়, আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। গোবিন্দকে বলে, কী অবস্থা?

ঠাওর পাচ্ছিনে। টেনে জবাব দেয় গোবিন্দ।

রুগ্ন ছেলেটার মা কাজ করছে আর বলছে, ভগবান···মুখ রেখ। কাজটা গেলে সবাই মরব।

সন্ধ্যার পর সমস্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দূর থেকে ভেসে এল মিলিত গলার কোলাহল, ট্রাকের গোঙানি, হুইসলের সংকেতধ্বনি।

আচমকা বন্যার মত পথে পথে ছুটছে মানুষ। কী হল? কী হল?

গোবিন্দ ছুটে বেরুবার মুখে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে নগেন···অভুক্ত ক্লান্ত।

কী হল নগেন?

সব ভেস্তে দিয়েছে।

কী করে?

নগেন ধাঁধা ভরা চোখে বলল, শালা টেরই পেলাম না। আমরা ঠিক ছিলুম···ম্যানেজার শালা পেরায় কাত মেরেছিল, সেল সায়েবটা আমাদের পায়ে ধরতে অব্ধি এসেছিল, মাইরি! এর মধ্যে কে যে শালা পুলিসের গায়ে ঢিল মারলে, ব্যাস্ অমনি পুলিস লাঠি চালিয়ে দিলে।···তাজ্জব, কেউ পয়লা পালাচ্ছিল না, কতকগুলো ডরপোঁক এমন চেঁচামেচি করে ছুটতে লাগল—

নগেনের কথা শেষ না হতেই দেখা গেল অনেকে ফিরে আসছে। জমজমাট হয়ে উঠছে বস্তি।

দেখা গেল সর্বসাকুল্যে এগারজন এ বস্তির ছাঁটাই হয়েছে।

দুলারী এর ওর পিছনে ছুটেছে; জিজ্ঞেস করছে, আমার আদমিটা··· তাকে দেখেছ?

কে একজন বলে উঠল, আমি দেখেছি।

কোথায়?

কয়জনের সঙ্গে তাকে একটা জালের গাড়িতে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে। আর একজন বলল, হ্যাঁ আমিও দেখেছি। তাকে আমি হাঁক দিলুম—

দুলারী তখন একটা চিৎকার করে বাইরের দিকে ছুটে গেল, আমি জানতুম—জানতুম!

গোবিন্দ গিয়ে তাকে ধরে ফেলল, দোস্তানি যেও না এ ভাবে—যেও না।

দুলারী হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্ত জোর করে কেঁদে উঠল, আমি থানায় যাব।

কে চেঁচিয়ে উঠল, গাড়িটা সদরের দিকে গেছে।

দুলারী মাটিতে মুখ দিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে উঠল, জানতুম—আমি জানতুম। এমনি করে আমার ঘর ভাঙবে—জানতুম।

গোবিন্দ তাকে জোর করে ঘরে নিয়ে গেল। নানান্ কথা বলল, কিন্তু দুলারীর কান্নার তোড়ে ভেসে গেল সব।

ভোরবেলা গোবিন্দ দরজা খুলেই দেখল লোটাকম্বল হাতে নগেন দাঁড়িয়ে আছে। বলল, ফোরটুয়েন্টি চললাম বেরাদার।

কোথা যাবে? চমকে উঠল গোবিন্দ।

নগেন হেসে বলল, কাজের খোঁজে।

তারপর হঠাৎ হাসিটা উবে গিয়ে মুখটা তার গম্ভীর হয়ে উঠল, ফোরটুয়েন্টি চলে যাচ্ছি, মনে কোন দুঃখ রেখ না। আর···মাইরি বলছি, তোমাকে কোনদিন ভুলতে পারব না। সম্বল নেই আধলা, কিন্তক্ কালরাতের তোমার কথাগুলোই আমার সম্বল।

বলে সে তাকাল গোবিন্দের দিকে। এখনো তার চোখে মুখে আঘাতের দাগ। আবার হেসে সে পিঠে ঝোলা নিয়ে চলতে শুরু

করে হঠাৎ আবার দাঁড়াল। ফিরে এসে তাড়াতাড়ি বলল, জানো ফোরটুয়েন্টি, রাগটা শালা চণ্ডাল। ফুলকি যদি কখনো আসে তবে বলো—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে চকিতে পিছন ফিরে সে চলে গেল। গোবিন্দ তাকে ডাকতে চাইল স্বর ফুটল না গলায়। কেবল তার বুকের মধ্যে যেন কে হৃৎপিণ্ডটা দু-হাতে মুঠো করে টিপে ধরেছে, চেপে দিয়েছে কণ্ঠনালীটা।

ছাঁটাইয়ের ঘা দগ্‌দগে হয়ে উঠেছে। হরিশ-নন্দ বেকার হয়ে অবধি দিনে রাত্রে মারামারি আরম্ভ করেছে আবার। সেই রুগ্ন ছেলেটার বাপ দাপাদাপি করছে পাগলের মত। সবাই ছুটোছুটি করছে ইঁটের কারখানায়, কাঠের গোলায়, রিক্সা মালিকের দরজায়। গোবিন্দের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই বাড়িওয়ালা বলছে, আমি কি করতে পারি?
অর্থাৎ বস্তির এ বিড়ম্বনার দায়িত্ব যেন অনেকখানিই তার।
দুলারী খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছে, সারা দিন পড়ে আছে ঘরে।
গোবিন্দ এসে ডাকল, দোস্তানি!
দুলারী মুখ তুলল। কান্নায় ফোলা মুখ।
গোবিন্দ কাছে এসে তার পাশে বসে বলল, দুখ কি জীবনভর থাকে?
দুলারী হঠাৎ গোবিন্দের দু-হাত ধরে কেঁদে উঠল, সুখ নেই এ জিন্দিগীতে। তোমাদের আমি কিছুতেই বুঝি না। কোথায় তোমাদের মন বারবার ছুটে যায়, কোথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে কেন তোমরা আমাদের কাছে আস, কেন ঘর কর? ওর মনে যদি এই ছিল, তবে কেন আমার জান চৌপাট করল।
এলানো আঁচল, এলো চুল, সিন্দুরহীন কপালে দুলারী যেন যোগিনী হয়েছে।

গোবিন্দ বলল, গল্তি সমাঝো না গণেশকে। সে হল আসল ঘরওয়ালা মানুষ, ওর প্রাণে যত মহব্বত, তা আর কার আছে? দোস্তানি, ওর কানে যে মন্ত্র পড়েছে, তাতে ও সিদ্ধির নেশায় পাগল হয়ে গেছে। জেল ফাঁসি সেখানে তুচ্ছ। তুমি আমিও একদিন ওর মতই পাগল হয়ে ছুটে যাব। বলতে বলতে তার দৃষ্টি অসীম শূন্যে হারিয়ে গেল। সে চোখে যেন ঝলমলিয়ে উঠল কিসের আলো।

দুলারী তাকাল গোবিন্দের মুখের দিকে। গোবিন্দের মাথাটা মস্ত বড় হয়ে উঠেছে চুলের ভারে। মুখটা শুকিয়ে যেন শিশুর মত ছোট হয়ে গেছে। ক্ষীণজীবী হয়ে গেছে বড়। হঠাৎ তার বড় লজ্জা করে উঠল যেন নিজের কান্নার জন্যে। সে গোবিন্দের হাত ধরে বলল, কী দেখছ তুমি?

আচমকা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল গোবিন্দ, কিছু না।

এরকম জবাব শুনে আবার কান্না আসে দুলারীর। বলল, জানি, তুমিও কোন মতলব ভাঁজছ। দিনরাত তোমার পেছনে দুশমন,— তুমিও আমাকে ছেড়ে যাবে।

না দোস্তানি, আমরা সব একসঙ্গে যাব।

দুলারী বলল, তা যদি হয়, তাহলে তো আমিও তোমাদের সাথী হতে পারব।

হাঁ দোস্তানি···তাই। বলে গোবিন্দ নিজের হাতে তার চোখের জল মুছিয়ে দিল। দিয়ে কেমন যেন অবশ শরীরে সে দুলারীর গালে হাত রেখে নিঝুম হয়ে গেল। পরমুহূর্তে দুলারীর নিশ্বাসে চমক ফিরতেই, দুলারী জিজ্ঞেস করল, কি?

কিছু না। বলে বেরিয়ে গেল গোবিন্দ।

ক-দিন পর ভোরবেলা নন্দ-হরিশের চিৎকারে হুলুস্থুল পড়ে গেল সারা বস্তিময়। সবাই সেখানে ছুটে এল। কী হয়েছে?

লোটন বউ পালিয়ে গেছে।

নন্দ হরিশ পাগলের মত ছুটোছুটি শুরু করল এখানে সেখানে, মহল্লায় এলাকায়। জান পহ্‌চান আদমি আত্মীয়স্বজনের ঘরে।…নেই কোথাও।

সারা দিন পরে একেবারে নিরাশ হয়ে তারা দুই ভাই হঠাৎ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল।

এ বলে, তুই তো শালা রোজ আগে মারামারি করতিস্?

ও বলে, তুই তো করতিস্।

বলতে বলতে তারা হঠাৎ হাতাহাতি শুরু করে দিয়ে আবার নিজেরাই থেমে গিয়ে যেন অবাক্ হয়ে ঘরের খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ছাই পোড়া উনুন, রান্নার সরঞ্জাম সব পড়ে আছে। পাতা আছে লোটন বউয়ের পীড়িটা। কালকের মারামারির সময় ওটা আর তোলা হয়নি।

গোবিন্দ এসে কাছে দাঁড়াতেই নন্দ বলে উঠল, বলেছিল সে, আমরা মারামারি করলে গলায় দড়ি লাগাবে।

হরিশ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, তবে বাচ্চাটাও মরে যাবে তো?

কথা না বলে সরে আসে হঠাৎ গোবিন্দ। আজকাল কেমন অস্থির অস্থির লাগে তার। নিজেকে বড় একা মনে হয়। জগতে সে যেন নিঃসঙ্গ। দুলারীর কাছে বার বার যেতে চায় মনটা, কিন্তু নিজের কাছেই যেন তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অবসর সময়ে সে দুলারীর কাছে বসে বসে নানান কথা বলে। আজকাল সে মহল্লায় মহল্লায় যায় গণেশের বন্ধুদের কাছে, তাদের সঙ্গে

কারখানা কোম্পানী নিয়ে নানান কথা আলোচনা করে। আস্তে আস্তে সে এখানকার মজুর সংগঠনের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। যেন জলে জল টেনে নিয়ে যাওয়ার মত সে এক জোয়ারের তরঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, তাকে না হলে আজকাল আসর বৈঠক জমে না। গোবিন্দের চরিত্রটা অনেকের কাছে আজ আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছে। এইসব কারণেই আরও বিশেষ করে বস্তির মামলাটা যেন এ এলাকার সমস্ত বস্তিবাসীদের জয়-পরাজয়ের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। শেষ নেই আলোচনা বিলোচনার। এমন কি যেচেও অনেকে জিজ্ঞেস করে, মামলাটা চালাতে পয়সা কড়ি কিছু লাগবে কিনা। এ সমস্ত কথাই সে এসে বলে দুলারীকে। কিন্তু ভালো করে তাকাতে পারে না দুলারীর দিকে। কোথায় যেন খচ করে বাজে, নিজেকে নিয়ে আজ তার ভয় হয়।

দুলারী আজকাল কলে হাজিরা দিচ্ছে আবার। আবার কাজ ধরেছে। গোবিন্দকে কাছে পেলে খুশি হলেও তার কেমন যেন আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব। সে হঠাৎ হাসে, হঠাৎ রাগ করে। কিংবা গোবিন্দ একটু কড়া কথা কিছু বললেই কেঁদে ফেলে। কোন কোন সময় গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে তার বান্ধবীর বুক মুচড়ে ওঠে, মনে মনে বলে, মানুষটা যেন দিনকে দিন কি হয়ে যাচ্ছে। তারপর কি এক বিচিত্র চিন্তায় মন তার কোন্ অতলে হারিয়ে যায়, যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নিজের ছায়ার দিকে। পরমুহূর্তে রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে গোবিন্দকে বলে, হটো তুমি, আজ আমি পাকাব।

সময় পেলেই সে আজকাল রান্নার কাজটা নিজের হাতে নিয়ে নেয়।

শীত যায়, বসন্ত আসে। মিঠে মিঠে হাওয়া বয়। রাত্রির আকাশ ভরা তারা। পূর্বে কর্ড রোডের বন গাছপালা সরসরিয়ে হাওয়া ছুটে আসে। রেল লাইনের ওপাশ থেকে মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলা ধাপা থেকে বয়ে আসে দুর্গন্ধ।

শীতের শেষে আবার উঠোন জুড়ে আড্ডা বসতে আরম্ভ করেছে। বৈজু চামার প্রত্যহ পাঠক ঠাকুরের মত রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর আসর বসায়। হাওয়ায় লম্প আর কেঁসোর শিষ্‌গুলি সব সময় অস্থির।

সব ভোলা রসিকের হারমোনিয়মটার বেলো ফেটে গিয়ে পেঁ পোঁর চেয়ে কোঁস্ ফাঁস্ শব্দই বেশী শোনা যায়।

এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে শিশুদের যোগেড়ী নাচ আর দুর্বোধ্য ভাষায় খেমসা গান। অর্থাৎ এ হল পশ্চিম প্রদেশগুলোর হোলির আগমনী উৎসব। একটা ছেলেকে মেয়ে সাজায়, ভঁাড় বেশে সাজায় একটি পুরুষকে, তার থাকে নকল ঘোড়া। লেজ তুলে কেশর দুলিয়ে, ঝুমুরের ঝুম্‌ঝুম শব্দে সে টগ্‌বগ্ করে ছোটে আর গায়। কিন্তু শিশুদের নকল ঘোড়া নেই, দোসরদেরই একজনকে ঘোড়া সাজাতে হয়।

সেই রুগ্ন ছেলেটি তাকিয়ে দেখে। সে প্রায় অথর্ব হয়ে গেছে। তবুও যোগেড়ীর ঘোড়সওয়ারকে দেখে আপন মনে বলে ওঠে :

মাকি সায়েব, মাকি সায়েব, বিলেত চলেছে,
ডানা কাটা পরী মেম, সঙ্গে চলেছে।

বাপটা তার বেকার হয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। মা সারা দিন কুড়োয় কয়লা গোবর, এখানে সেখানে ছোটে কাজের সন্ধানে। এখন সে বেশীর ভাগ সময় একলা থাকে। কখনো ফোটুকি চাচাকে পেলে আরম্ভ করে প্রাণ ভরে গল্প।

সেই বুড়োটে গম্ভীর গলাটা কি রকম নিস্তেজ হয়ে এসেছে। কখনো জয়দেবের কৃষ্ণগাথা, কখনো তুলসীদাসের রামায়ণ সে একঘেয়ে সুরে বলে যায় আর ঈশ্বরের প্রতি দুরন্ত অভিমানে ভরে ওঠে তার গলা।
আর নেই নেই শব্দে দিগন্ত মুখরিত। এটা নেই, সেটা নেই করে প্রত্যহ ঘরে ঘরে ঝগড়া লেগেই আছে। ছাঁটাই হওয়া ঘরগুলোর দিকে তাকানো যায় না।

শুক্রবারের রাতটা নিঝুম হতে একটু সময় লাগে। হপ্তার দিন, দিন দেনা পাওনার, হিসেব নিকেশের।
এইদিন মাদারি খেলোয়াড় তার দিনের শেষে খেলা দেখায় বস্তির উঠোনে। সপ্তাহান্তে, আমোদ আহ্লাদের সময়, খেলাটা জমে যায় কিছু পাওনাও হয় মাদারি খেলোয়াড়ের।
রাত হয়ে গেছে। গোবিন্দ আজকের মত রান্নাঘর বন্ধ করে ঘরে যেতে গিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেড়ার ফাঁকে দেখল, মাদারি খেলোয়াড়ের ঘরে আলো জ্বলছে। কি মনে করে গোবিন্দ উঁকি দিল বেড়ার ফুটো দিয়ে। ভিতরের দিকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে রইল সে। দেখল, ছেড়ে দেওয়া সাপ দুটো মাদারি খেলোয়াড়ের গায়ের উপর বার বার উঠে আসছে। খেলোয়াড় নিজে তার রোজকার ফ্যান একটা থালায় ঢেলে খানিকটা নুন মিশিয়ে আঙুল দিয়ে নাড়তে লাগল। অমনি সাপ দুটো কিলবিল করে তার গায়ের থেকে নেমে মুখ দিতে গেল ফ্যানের থালায়। সাপ দুটোর মুখে থাবড়া দিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠল সে, ইস্টাপ্...ইস্টাপ ডারলিন্, নট্ নাউ।
সাপ দুটো অপলক চোখে থালাটার দিকে তাকিয়ে কেবলি চেরা জিভ বার করতে লাগল আর খেলোয়াড় থালাটা তুলে এক নিশ্বাসে কোঁত

কোঁত করে খেয়ে ফেলল অনেকটা ফ্যান। তারপর থালাটা নামাতেই সাপ দুটো হুমড়ি খেয়ে পড়ল থালার উপর।

সে একটা আরামের শব্দ করে বলে উঠল, নটু ফ্যান···ইসকো বোল্‌তা মিল্‌,···দুধ। বলে আপন মনে হিহি করে হেসে উঠল, বলে সবাই, সাপে খায়। ষ্ট্যাটিজ ফোরটুয়েন্টি···হি হি···।

লম্পের আলো আঁধারিতে যেন লোকটাকে চিনতে পারছে না গোবিন্দ। তার নিজের পেটের মধ্যে যেন কি একটা পাক খেয়ে উঠল। ওহো! তাই মাদারি খেলোয়াড় বার বার ফ্যানের কথাটি বলতে ভোলে না। রোজকার পাওনা খাবারে পেট ভরে না তার। তাই, তাই!

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে খেলোয়াড়ের ফ্যানের পাত্রটিতে ফ্যান রাখার সময় গোবিন্দ এক দলা ভাত তার মধ্যে ফেলে দিয়ে বলল, যা শালা, খুব কষে আমাদের ফোরটুয়েন্টি কর্‌।

রাতের নিরালায় ফ্যান ঢালতে গিয়ে ভাতের দলাটা দস্‌ করে পড়তেই চম্‌কে উঠল খেলোয়াড়। বিকৃত মুখে সন্দেহ ভরে আঙুল দিয়ে নেড়ে চেড়ে যখন দেখল ভাত তখন সে নিঃশব্দ উল্লাসে মুখ ব্যাদান করে ফেললে।—ভাত—রাইস্‌? আই সি!

বলে ভাতগুলো আলাদা করে নিয়ে অস্থির সাপ দুটোর দিকে বাড়িয়ে দিল ফ্যান, বলল, নে হারামজাদীরা, আজ খুব করে খা।

তারপর হেসে উঠে বলল, ফোরটুয়েন্টি মাদারিকা কানা চিড়িয়া বন্‌ গয়া। মেরা মাদারি! রোজ ওকে এমনি কানা করে দিও।

বুঝি মাদারির গুণেই গোবিন্দ রোজই কানা হয়ে যেত। কেবল খাবার সময় এ সংসারের উপর, নাকি নিজের উপরই তার রাগে ভরে উঠত মনটা।

মাদারি খেলোয়াড়ের কথাটা দুলারীকে বলবে মনে করে সন্ধ্যার একটু পরে গোবিন্দ ঘরে ঢুকে দেখল দুলারী একেবারে একলা চুপচাপ বসে আছে, কারখানার কাপড়টাও ছাড়েনি। গোবিন্দকে দেখে একটু চমকে উঠল সে। এমনি চমকায় সে আজকাল। হাসে, কথা বলে, হঠাৎ চমকে যায়। গোবিন্দ বলল, কি ভাবছ একমনে? দোস্তের কথা?

দুলারী হঠাৎ বলে উঠল, থাক্ তার কথা বল না তুমি।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল গোবিন্দ, কেন?

দুলারী হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার সঙ্গে বসে বসে এত বাত্ তোমাকে করতে হবে না।

গোবিন্দ একেবারে দিশেহারার মত দু-পা এগিয়ে এসে বলল, কেন দোস্তানি।

দুলারী মুখ ফিরিয়ে বলল তীব্র গলায়, তুমিই তো বেচারীকে উস্কানি দিয়ে জেলে পাঠিয়েছ জানি না, না?

গোবিন্দ নির্বাক, নিথর।

দুলারী একেবারে তিক্ত গলায় হিসিয়ে উঠল, ওকে জেলে পাঠিয়ে তুমি আমাকে—আমার সঙ্গে মহব্বত ফাঁদতে চাও, জানি না ভেবেছ?

গোবিন্দের মনে হল সে অন্ধ হয়ে গেছে, বোবা হয়ে গেছে, কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে, কে যেন গরম শিক দিয়ে তাকে খোঁচাচ্ছে। সে যন্ত্রণায় ফিস্ফিস্ করে উঠল, দোস্তানি···দোস্তানি।

বলতে বলতে সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

দুলারী চকিতে মুখ তুলে ডাকতে গেল গোবিন্দকে। কিন্তু তার আগে গোবিন্দ উধাও। দুলারী দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে উঠল কান্নায়।—না না···।

সম্বিৎ নেই গোবিন্দের। চলছে, যেন নিজের পায়ে নয়। একবার

ভাবল মহল্লার দিকে যাবে। কিন্তু মোড় ফিরে নিউ কড রোড পেরিয়ে, পুবের ঝোপে ঝাড়ে ছাওয়া অন্ধকার পথে রেল লাইনের দিকে এগিয়ে চলল। চলল যেন নিশি পাওয়া অচেতন মানুষের মত। অবশ, বিহ্বল।
হুস্ হুস্ করে দানবীয় শব্দে ছুটে আসছে একটা রেলগাড়ি দক্ষিণ দিক থেকে।
গোবিন্দের চোখের উপর ভেসে উঠল পুবের এই নাক বরাবর রাস্তাটা।···নীলগঞ্জ···বারাসত··· বসিরহাট··· ইটিণ্ডেঘাট··· ইছামতী! নোনা কালোবরণী ইছামতী মানুষের মনের ইচ্ছা পূরণ করেছে।··· ওপারে মুখ থুবড়ে পড়া ছুতোরেব ঘর, ছুতোর বউ, মাটি মাখা হোঁতকা ছেলে, ছোট বিনুনির চুড়ো বাঁধা মেয়ে, আর···
গাড়িটা এসে পড়েছে, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্···। কে? চোখের সামনে ভেসে উঠল অনেকগুলো মুখ। বাড়িওয়ালা, কালো, ফ্ুলকি, নগেন, রুগ্ন ছেলেটা, গণেশ, ছাঁটাই, মাম্‌লা··· দুলারী!···
ঘং করে একটা শব্দের সঙ্গে লাইনের গেটটা একবার ককিয়ে বন্ধ হয়ে গেল।
কে? ফোরটুয়েন্টি? দুটো লোক দাঁড়িয়ে পড়ল।
গোবিন্দ খানিকটা যেন বিস্ময়ের ঘোরে লক্ষ্য করল, দুটো ভিন মহল্লার লোক।
রেল এঞ্জিনের উত্তপ্ত হাওয়া ঝাপটা মেরে গেল চোখে মুখে।
কোথায় চলেছ রাত করে? একজন জিজ্ঞেস করল।
গোবিন্দ বলল, এমনি, ঘুরতে।
লোক দুটো হো হো করে হেসে উঠে তার হাত ধরে শহরের দিকে এগুলো। বলল, পাগলা।···হ্যাঁ, ফোরটুয়েন্টি, মাজি ভাতা আদায়ের পিলানটা তুমি যা বাতলেছ, সেটাই—
লোক দুটো বক্‌বক্ করতে লাগল নানান্ কথা।

একটা নিশ্বাস ফেলে বস্তির মধ্যে ঢুকল গিয়ে গোবিন্দ। সকলে খাওয়ার অপেক্ষা করছে তার জন্ত।
মনের মধ্যে একটা ভাবনা কেবলি আনাগোনা করতে লাগল, মাছ ডাঙায় উঠলে মরে। এ সংসার ছেড়ে মানুষ কোথায় খুঁজবে মুক্তি।

বেলা এগারটা। গোবিন্দ বসে আছে বাড়িওয়ালার কাছে, বাইরের রকে।
ঠিক এ সময়েই এল সেই মালিক, ফিটফাট বেঁটে বিরিজামোহন। সঙ্গে একটা ডাকঘরের পিয়ন।
এই যে বাবুসাহেব, জয় গোপালজী। এ পিওনটা আপনার দৌলতখানা খুঁজছিল, তাই দেখাতে নিয়ে এলুম।
পিওনটা একটা খাম আর পেন্সিল বাড়িয়ে দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে সই করতে বলল।
বিরিজামোহন বলল, বাবুসাহেবকে কালি দাও, টিপসই দেবে।
বাড়িওয়ালা প্রথম মুখ খুলেই বলল, আমি কোন শূয়োরের বাচ্চার মত মুরুখ নই।
বলে বড় বড় অক্ষরে খাপছাড়াভাবে একটা সই করে দিল। চিঠিটা একটা হিন্দী ভাষায় নোটিশ—ঠিকা মেয়াদ আগামী তিন মাসের মধ্যে শেষ হবে। তার মধ্যে যেন জমি খালাস করে দেওয়া হয়।
বিরিজামোহন ব্যাপারটা জেনেই চোখ পিটপিট করে পকেট থেকে সেই রাংতার মোড়ক খুলে সিদ্ধি বের করে বলল, বাবুসাহেব?
বাড়িওয়ালা বলল, চোরের মালে থুক দিই।
বিরিজামোহন নিজে একটি গুলি গিলে বলল, হ্যাঁ বাবুসাহেব, আপনার

এখানে যে খুব একটা চালু ছোকরা আছে, ফোরটুয়েন্টি নাম। সবাই তার কথা বলে, কিন্তু আমি তো চিনিনে।

নিশপিশ করে উঠছে বাড়িওয়ালার হাত পা। খেঁকিয়ে উঠল, কোন ...য়াচোরহু ওকে চেনে না।

বিরিজামো ন হেসে বলল, আপনি চটে যাচ্ছেন বাবুসাহেব। কিন্তু আমি ভালো মনেই বলছি। তা সে চার শো বিশ আপনার মামলাটা কি রকম চালাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্ত গোবিন্দ ভুলে গেল অন্ত সব কথা। লোকটার নিষ্ঠুর ভাঁড়ামি সে সহ্ করতে পারল না। কাছে উঠে এসে সে বলল, কী দরকার আপনার?

তুই কে রে? লোকটা দাঁত খিঁচোল।

আমি যে-ই হই, তোমার আর কি বলার আছে? শক্ত হয়ে উঠেছে গোবিন্দের হাত। কিন্তু বিরিজামোহন বাড়িওয়ালার দিকেই ফিরে বলল, তাহলে আপনার পাকা মোকামের পিলানটা—

রসিকতাটুকু শেষ না হতে থস করে এক গাদা গোবর বিরিজামোহনের গিলে করা পাঞ্জাবীর বুকে এসে পড়ল যেন একটা পাণ্টা রসিকতার মত। মুহূর্তে ক্ষেপে বারুদ হয়ে উঠল বিরিজামোহন, কোন্ শালা রে? বলতেই খানিকটা কাদা এসে পড়ল তার নাকে মুখে।

বাড়িওয়ালা হা হা করে হেসে উঠল। বলে উঠল, আরে ছি ছি, কেয়া বাত্। হোলি আ গয়া?

বিরিজামোহন লাফিয়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে খিস্তি করতে লাগল। কিন্তু গোবর কাদার বৃষ্টি থামল না।

বিরিজামোহন যখন ছুটে পালাতে বাধ্য হল, তখন সদী বুড়ি বেরিয়ে এল বস্তির ভিতর থেকে হাত ভরা কাদা গোবর আর একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে।

কিন্তু বাড়িওয়ালার মুখে আর একটুও হাসি নেই। সে বলল, ফোরটুয়েন্টি, তা হলে মামলাটা একেবারে ধোঁকা দিচ্ছিস্ আমাকে? গোবিন্দ স্তম্ভিত, নির্বাক। বুঝি তার প্রতি সকলের অবিশ্বাস ও অপমানেরই পালা পড়েছে আজকাল। বাড়িওয়ালা বলল, কথা বলছিস্ না যে? এতদিন যে মামলা খরচের পয়সা নিয়েছিস্, সে সব—তা হলে—

গোবিন্দ যেন জ্বলে উঠল, বলল, সত্যি তুমি মুখ্যু, যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বল না।

বলে সে সেখান থেকে সোজা মাঠ ভেঙে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আশ্চর্য! কোথা থেকে কি হয়ে গেল। বাড়িওয়ালা নিজের কপালটা চাপড়ে বারবার বলতে লাগল, কেবলি ঠকতে জন্মেছি এ জীবনে, কেবল ঠকতে।

চাঁদ উঠেছে।

ফাল্গুনের হাওয়া মাতাল। সে হাওয়ায় ভেসে আসছে পেপার মিলের দুর্গন্ধ। বস্তিটাকে মনে হয় চার দেওয়ালের একটা বেড়া। চালার খোলাগুলো রোদে জ্বলে কালো হয়ে দেখাচ্ছে যেন সারি সারি ময়াল সাপের গায়ের রেখা। চাঁদের আলোয় নর্দমার পাঁকে কি যেন ঝিকমিক করে নড়ে। মাতাল বাতাসে তার গন্ধ উঠে আসছে।

উঠোনে বসেছে ছোট ছোট আসর। হারমোনিয়ামের শব্দ শোনা যাচ্ছে প্যাঁ···পোঁ···অনেকগুলো গলার গান শোনা যাচ্ছে একসঙ্গে। তার মধ্যে মিশে গেছে সেই বুড়োটে গলার গান, কোন ঘরে ঝগড়া চল্‌ছে, কোন ঘরে হাসি, কেউ বা কাঁদছে।

একদল বাচ্চা খেলা করছে উঠোনে।

সেই রুগ্ন ছেলেটা রকে চিত হয়ে শুয়ে হাঁ করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে, তার পাশে বসে আছে গোবিন্দ। ওর মা গেছে গোবিন্দকে বসিয়ে কোথায় কোন্ বাবুর কুঠিতে, কাজের জন্য। ছেলেটার গায়ে অসহ্য জ্বর। ওর তাপে মাটি তেতে উঠছে। গোবিন্দ আজকাল যেন খানিকটা একঘরে হয়ে গিয়েছে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে তার খুবই কম কথা হয়। তাও হয়তো হত না, যদি না সে একটা অর্ডার পেত কোর্ট থেকে। সেই অর্ডারে ছিল, মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জমি বর্তমান দখলকারীর দখলেই থাকবে।

গোবিন্দ ছেলেটার গায়ে হাত দিয়ে দেখল একবার, জ্বরটা যেন কমছে একটু।

ফিসফিস করে ডাকল ছেলেটা, ফোটুর্টি চাচা !

বল বাবা।

মাকি সায়েব।

কোথা ?

ছেলেটা একদৃষ্টে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। গোবিন্দও তাকাল চাঁদের দিকে। পূর্ণ চাঁদ যেন আকাশের কোল জোড়া সোনা।

দুলারীর সঙ্গে তার একেবারেই কথা নেই। কখনো মুখোমুখি দেখা হয়, হয়তো দুজনেই থমকে দাঁড়ায়, কিন্তু আর কিছু না। আবার যে যার পথে চলে যায়।

গোবিন্দ এখানকার কাজটুকু শেষ করেই বাইরে চলে যায়। সারা দিন কোথায় কোথায় ঘোরে। বস্তিতে কোন সময় দেখা যায়, ঝি-বহুড়িদের কাজের ফাঁকে সে তাদের বাচ্চাদেরও কোলে করে রাখে, এর তার খুঁটিনাটি কাজ করে দেয়।

বাইরের থেকে মনে হয়, বস্তিটার কোনই বুঝি পরিবর্তন হয়নি।

তবু ঠিক যেন আগের মত নেই।

ফুলকির সঙ্গে কালো সেই যে চলে গেছে, আজ অবধি আসেনি। গোবিন্দ শুনেছে ফুলকির কি একটা কালরোগ হয়েছে, অথর্ব হয়ে গেছে। কেউ ছোঁয় না কালো ছাড়া। কালো খাওয়ায়, রোগের সেবা করে। এইবারটি যে তার শেষবার, সে বলেছিল। জানটা যে তার কাছে সস্তা নয়!

একটু পরেই রুগ্ন ছেলেটার মা এল। এসেই ছেলের গায়ে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠল, হায় রাম রাম—একি গোভূতের কাছে ছেলে-টাকে রেখে গেছি গো!

গোবিন্দ একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। বলল, কী হয়েছে?

মা তেমনি ভাবেই বলল, বলে কি গো চোখ খেগোটা? বাছা যে আমার মরছে।

বলে সে তার ছেলের মুখ থেকে হঠাৎ জ্যান্ত কয়েকটা কৃমি টেনে বার করে ফেলল। কিন্তু ছেলেটা তখন মরে গেছে।

চাঁদের আলোয় কীটগুলো কিলবিল্ করছে। সবাই এসে দাঁড়াল সেখানে।

মা তার একটানা গলায় কাঁদতে লাগল, ওরে বাবা···মাকি সায়েবের বিলেত দেখা তোর যে হল না। এমন যমের কাছেই তোকে রেখে গেছ্লাম।

নির্বাক হতভম্ব গোবিন্দের দিকে সবাই এমন ভাবে তাকাল যেন সত্যি যম দেখছে।

চাঁদ অবাক হয়ে যেন তাকিয়ে আছে বস্তিটার দিকে।

কে একটা বহুড়ি শিউরে উঠে বলল, হায় রামজী! ওর কাছে আমার বাচ্চাকে দিয়ে আমি আমার কাজ করি। আর কভি নয়।

দুলারীও সকলের আড়াল থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গোবিন্দের

দিকে। হঠাৎ তার বুকটা কেমন টন্‌টন্‌ করে ওঠে ওই হতভম্ব মুখটার দিকে চেয়ে। কি যেন ঠেলে আসে গলার কাছে। কিন্তু কিছু না বলে সে তাড়াতাড়ি ঘরের অন্ধকার কোলে মিশে যায়।

হাওয়া মাতাল হয়েছে। মাতাল হয়ে উঠছে বস্তি। এবার ফাগুয়া পড়েছে চৈত্র মাসের একেবারে শেষে, বৈশাখের লাগোয়া।

কাজের অবসরটুকু ঢোল করতাল ও গানের শব্দে মুখরিত। কারো খেয়াল নেই যে, যে-কোন মুহূর্তে তাদের এখান থেকে উঠে যাওয়ার হুকুম আসতে পারে।

গোবিন্দের মন অস্থির, কিন্তু ধীর। মামলার শেষ শুনানীর দিন এসে পড়ছে।

আর মাত্র মাস খানেক বাকি। এটা শেষ না হলে সে বিদায় নিতে পারছে না।

বাড়িওয়ালা যেন হতাশায় ভেঙে পড়েছে। সে গোবিন্দকে শুনিয়ে শুনিয়েই সবাইকে বলছে, তল্পি গোটা সব…আর আমার কাছে তোদের রাখতে পারলাম না।

গোবিন্দ বোঝে, এ শুধু তার উপর রাগ নয়, তার জীবনের সব শেষের আশা ধুলিসাৎ হওয়ার যন্ত্রণা।

উকিলের কাছে বারবার গিয়েও কোন আশা পাচ্ছে না গোবিন্দ। একবার ভেবেছিল, এ বাড়ির সবাইকে নিয়ে সে একটা ডেপুটেশন যাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। কিন্তু তাতে মামলার ফল রোখা যাবে না।

এ চৈত্র হাওয়াতে বুঝি দুলারীর বিরহ আর বাধা মানতে চায় না। সে বারবার পা বাড়ায়, গোবিন্দের কাছে তার বদ্ধ হৃদয়ের সমস্ত কথা খুলে বলতে, গোবিন্দের জেলবন্দী দোস্তের নামটি শুনতে। কিন্তু

গোবিন্দ যেন ইহজগতে নেই। সে পাগল হয়ে গেছে।
প্রায় পাগলের মতই ছুটল গোবিন্দ উকিলের বাড়িতে। উকিল বলল, দেখ, আমার যা করার করব। তুমি যদি একটা ব্যারিস্টার আনতে পার, তা হলে খুব ভালো হয়।
গোবিন্দ একেবারে ভেঙে পড়ল, ব্যারিস্টার কোথা পাব বাবু?
উকিল বলল, তোমাকে আমি একটা ঠিকানা দিচ্ছি কলকাতার। সে ঠিকানায় গিয়ে তুমি যদি ব্যারিস্টারকে সব বলতে পার, তা হলে সে বিনা পয়সায়ও আসতে পারে। লোকটা গরীবের বন্ধু। পারবে যেতে?
পারব, বলল গোবিন্দ। কি না পারে সে। এখন যা বল, তাই। প্রাণ বল, সেটাও তুচ্ছ হয়ে গেছে।
তিন দিন গোবিন্দের কোন দেখা নেই।
বাড়িওয়ালা সকলের সামনে বসে বসে তাকে খিস্তি করছে, গালাগালি দিচ্ছে।
ফোরটুয়েন্টির কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হয়েছে। লোকটা গেল কোথায়। মামলার শেষ দিন যে ঘনিয়ে আসছে।
সমস্ত এলাকায় মহল্লাতেও তার কোন পাত্তা নেই।
তিন দিন পরে দেখা গেল, রুগ্ন ক্ষীণজীবী উসকোখুসকো গোবিন্দ এসে আবার হাজির হয়েছে। সবাই তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কোন কথা বলল না।
গোবিন্দও কোন কথা না বলে, নিজের কাজে লেগে গেল আবার স্বাভাবিকভাবে। কাজের শেষে সারা দিন বাইরে থাকে। বাড়িওয়ালা কিছু বললে বলে, একটা কাজ খুঁজছি কারখানায়।
দুলারী তাকে আড়াল থেকে দেখে, কিন্তু কখনো কাছে আসতে পারে না। গোবিন্দও দেখে কিন্তু সেটা যেন স্থবিরের চাউনি। তাতে

কোন ভাব নেই, বোধ নেই। তার বোবা বুকে কি কথা লুকোনো আছে, কেউ তা জানতেও পারে না।

বুঝি সে সত্যিই যম হয়েছে, এমনি নির্বাক হয়ে সে সবাইকে দেখে।

কেবল সদী বুড়ি আর মাদারি খেলোয়াড়ের সঙ্গে সময় পেলেই বক্‌বক্‌ করে। রান্নার কাজটা আজকাল তার আর কিছুতেই জমে না। দুলারীও আসে না সাহায্য করতে।

একদিন সে একটা মস্ত বড় গর্ত খুঁড়ে দিয়েছে বাচ্চাদের পায়খানার জন্য। মায়েরা যতই আগলাক, ফোর্টুন্টি চাচাকে কেউ ছাড়তে পারে না।

এর মধ্যেই একদিন রাতে খাওয়ার পর মাদারি খেলোয়াড় চেঁচিয়ে উঠল, গ্যাটাজ কোল্‌ ফোরটুয়েন্টি কা খেল্‌। দেখ একবার শালার কাজ। হিয়ার···ফ্যান্‌ উইথ্‌ রাইস···শালা রোজ এমনি ভাত নষ্ট করে মাইরি।

বলে সে ফ্যানের ভেতর থেকে এক দলা ভাত তুলে ফেলল।

সবাই একযোগে গোবিন্দের হতবাক মুখটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।—শালা ফ্যান ঢালতে জানে না।

কে বলল, তাই আমার ভাত রোজ কম পড়ে।

আর একজন বলল, মাইরি, আমারও পেট ভরে না।

এক দলা ভাতের জন্য হঠাৎ সকলের ক্ষুধার অভিযোগ হুড়মুড় করে ঝরে পড়ল। কিন্তু গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে মাদারি খেলোয়াড়ের মুখটা হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠল। ভাতগুলো চটকাতে চটকাতে সে বিড়বিড় করে উঠল, ব্যাড্‌···ভেরি ব্যাড্‌ দুনিয়া···আই ফল···ডেম্‌ ইস্টাপেড্‌···আমি-আমি।

হোলি উন্মত্ত বস্তি। ঢোল করতালের শব্দে আজ কান পাতা দায়। ঢোঁকে ঢোঁকে তাড়ি আর যোগেড়ী নাচে পাগল হয়ে গেছে সবাই। একটা ছোকরা নাচছে মেয়ে সেজে। উৎকট দেহভঙ্গি, কামাতুর কটাক্ষ, ঢলে ঢলে গায়ে পড়া, তার সঙ্গে যৌবনের রংদার গান খেম্‌সা। হাওয়া মাতাল, মন মাতাল, মাতাল হয়েছে আকাশ।

রংএ কাদায় মাখামাখি চলেছে, বাসন্তী রংএ ছোপানো পোশাকে ছোপ লেগেছে টকটকে লাল রংএর। ডুগডুগি বাজাচ্ছে মাদারি খেলওয়ালা, রঙ্গ করার জন্ম উঠোনে ছেড়ে দিয়েছে তার সাপ দুটো। ঝি-বহুড়িরা ঘোমটার ফাঁকে চোখের ইশারায় পুরুষদের আরও উস্‌কে দিচ্ছে। সদী বুড়ি প্রায় ন্যাংটো, বাড়িওয়ালাও সব ভুলে গড়াগড়ি খাচ্ছে কাদায়।

ফাগে রংএ ফাগুয়া উত্তাল।

দুলারী বাইরে আসেনি। সে তার বাসন্তী রংএ ছোপানো সাড়ীটি পরে, ঘরের মধ্যে লাল মাটির পাত্রে রক্ত আবীর নিয়ে হাত দিয়ে ঘাঁটছে। সামনেই ঠোঙায় রয়েছে নিজের হাতে বানানো টিকুলি, দোকানের জিলিপী, মণ্ডা, খাজা। আর সলজ্জ মুখে টিপে টিপে হাসছে।

আজকের দিনটির মতই মুখ তার মেঘমুক্ত। সব সংশয় পেরিয়ে আজ সে প্রস্তুত হয়েছে দোস্ত ফোরটুয়েণ্টির অভ্যর্থনার জন্ম। তার গোস্তাকি হয়েছে, তার পাপ হয়েছে। জীবনদাতাকে সে অপমান করেছে, আঘাত দিয়েছে।

অন্যান্ম বছর সে এমনি অপেক্ষা করে থাকত, কখন গণেশ আসবে। গণেশ যখন আসত কিছুটা মত্তাবস্থায়, তখন তারা দুজনে খেলত ফাগুয়া। আজ সে ফাগুয়া খেলবে দোস্তের সঙ্গে, যার কাছে নেই তার কোন মানার মানামানি।

দিন গেল, সন্ধ্যা গেল, প্রাণ রাঙিয়ে এল পূর্ণিমার রাত্রি। নাচে-গানে দ্বিগুণ উন্মত্ত হল বস্তি। কিন্তু গোবিন্দের দেখা নেই।

মধ্য রাতে ঘুম এসে হরণ করে নিয়ে গেল সব মত্তা। বস্তি নিঝুম হয়ে এল।

দুলারী তখনো বসে আছে দরজা খুলে, কান পেতে আছে বাইরের দিকে। তারপর এক সময় ঢলে পড়ল ঘুমে।

এবড়ো খেবড়ো উঠোনটা রংএ আবীরে বিচিত্র হয়ে হাঁ করে যেন তাকিয়ে রইল চাঁদের দিকে।

ভোরবেলা কারখানার বাঁশীর শব্দ কানে যেতে ধড়ফড়িয়ে উঠে দুলারী একমুহূর্ত হতভম্ব চোখে তাকিয়ে দেখল তার হোলির আয়োজন। তারপর পা দিয়ে সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে, দরজায় শেকল তুলে দিয়ে চলে গেল কারখানার দিকে।

গোবিন্দ তখন ফিরে এসেছে কলকাতা থেকে। গতকাল সে উকিলের কাছ থেকে সমস্ত নথীপত্র নিয়ে ব্যারিস্টারের কুঠিতে গিয়েছিল, আর ফিরতে পারেনি। আর তিন দিন মাত্র মামলার রায় বেরুতে বাকি। তার সময় নেই কোনদিকে নজর দেওয়ার।

আকাশে লেগেছে বৈশাখী রং, ঝলসানো তামাটে আভা।

মামলার ফলের একদিন আগে, ভোরবেলা সবাই উঠে বিকৃত মুখে নাকে কাপড় চাপা দিল। অসহ্য দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে চারদিক।

সবাই বাইরে এসে দেখল, বস্তির চারপাশে যেন সারা শহরের ময়লা ঢেলে [illegible] হয়েছে। কী ব্যাপার? কে ফেলল এত ময়লা?

একটু পরেই এল মিউনিসিপ্যালিটির হেল্‌থ্ অফিসার। সঙ্গে স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টর আর উল্লসিত বিরিজাবো[illegible]ন।

বিরিজামোহনই প্রথম বলে উঠল, এ একেবারের জানোয়ারের ডেরা। তারপর হেসে বলল, এই যে বাবুসাহেব, জয় গোপালজী। হেল অপ্‌সর সাব আপনার সঙ্গে থোড়া মোলাকাত করতে এসেছেন।

বাড়িওয়ালা খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেছে ব্যাপার দেখে। কেবল অসহ্য রাগে ও ঘৃণায় গোবিন্দ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোটরাগত চোখ দুটো তার জ্বলে উঠছে ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করে।

হ্যাটকোট্‌ পরা হেল্‌থ অফিসার ঘৃণায় মুখ কুঁচকে, নাকে রুমাল চেপে, চোখে গগল্‌স্‌ পরে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। পেছনে স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টর।

গোবিন্দ তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল, হুজুর চোখের ঠুলিটা খুলে ফেলে দিন, নইলে রং বোঝা যাবে না।

অফিসার সত্যি গগল্‌স্‌টা খুলে ফেলে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল গোবিন্দের দিকে।—কী বলছ?

গোবিন্দের মুখটাই আগুনের মত জ্বলে উঠল। কাছে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বলছি, হুজুরের তো সবই জানা আছে। আর দেখে কি হবে?

হোয়াট? হেল্‌থ্‌ অফিসারের মুখটা গোল আর লাল হয়ে উঠল।

গোবিন্দ আবার বলল, দু-দিন আগে এলেন না কেন হুজুর?

হেলথ্‌ অফিসার বললেন, তুমি বাড়িওয়ালা?

আমি ছুতোর, কিন্তু রাঁধিয়ে। বলে হাসতে গিয়ে হিংস্রভাবে দাঁত বের করে হিসিয়ে উঠল, কিন্তু হুজুর, জমিদারের পয়সা খাওয়া বেজন্মা নই। চোরের মত মিছে রিপোর্ট লেখা আমার পেশা নয়।

মানে? হেলথ্‌ অফিসার হয়তো রাগেই কাঁপতে থাকে থর্‌ থর্‌ করে।

বিরিজামোহন ধমকে উঠল গোবিন্দকে, এও কাম্‌বাক্ত!

চোপ শালা! গোবিন্দের বাঁ হাতের এক থাপ্পড়ে বিরিজামোহন একেবারে ময়লার মধ্যে গড়িয়ে পড়ল।

অমনি সবাই হেসে উঠে ধেয়ে এল এদিকে।
স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টর সরু গলায় ককিয়ে উঠল, স্যার, চলে আসুন, দে আর গুণ্ডাজ্।
তবে গুণ্ডার হাতেই আজ জান রেখে যেতে হবে, তাদের, যে শূয়ারের বাচ্চারা এ ময়লা ফেলিয়েছে। বলে গোবিন্দ হেলথ্ অফিসারের দিকে এগুতেই কে তাকে শক্ত হাতে ধরে ফেলল। সে তাকিয়ে দেখল, বাড়িওয়ালা।
হেলথ্ অফিসার ততক্ষণ স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টরের পিছে পিছে সরে পড়তে আরম্ভ করেছে। এদিকে বিরিজামোহনকে নিয়ে হল্লা চলেছে। অনেক কষ্টে উঠে বিরিজামোহন খিস্তি করতে করতে একটা উল্লুকের মত চলতে আরম্ভ করল। কেবল গোবিন্দ তেমনি জলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল পথের দিকে।

দুপুর বেলা। নির্বাক নিস্তব্ধ বস্তি। যেন নেশা করে পড়ে আছে। হাওয়া নেই, বদ্ধ গুমোট। বসন্ত গিয়ে গ্রীষ্ম আসছে। আসছে বৈশাখ। সবাই উন্মুখ হয়ে বসে আছে খবরের প্রত্যাশায়।
দুপুরের পর কোর্ট থেকে সবাই ফিরে এল খবর নিয়ে। জজ বলেছে—আইনতঃ যদিও জমিটা প্রজারই মৌরুসী, তবু মিউনিসিপ্যালিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এরকম একটা নোংরা আস্তানা বিশেষকে রাখা স্বাস্থ্য ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। যত শীঘ্র এর অপসারণ হয়, ততই মঙ্গল।
গোবিন্দের সমস্ত প্রচেষ্টা ভেসে গেছে। তার দু-হাত ধরে আক্ষেপ জানিয়ে গেছেন ব্যারিস্টার। উকিল আপসোস করেছে।
উঠোনে সবাই হাঁ করে বসে আছে। গোল হয়ে গেছে সকলের

চোখগুলো বিস্ময়ে, দুশ্চিন্তায়। একটা খাটিয়ার উপর খালি গায়ে শূন্য দৃষ্টিতে বসে আছে বাড়িওয়ালা। তার চোখের সামনে যেন সব অন্ধকার হয়ে গেছে। তার চিরজীবনের ব্যর্থতা যেন তার সামনে এসে খল্ খল্ করে হাসছে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে।

গলি মুখটায় এসে দাঁড়াল গোবিন্দ। হাড্ডিসার ক্ষীণজীবী চেহারা, উস্কো খুস্কো চুল, চোয়াল দুটো ছুঁচলো হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গায়ের জামাটা এখানে সেখানে ছেঁড়া। সর্বাঙ্গ ধূলিমলিন।

সবাই তার দিকে ফিরে তাকাল, কিন্তু কথা বলল না।

বাড়িওয়ালা মুখ ফিরিয়ে রইল তার দিক থেকে।

এমন সময় বাড়ির বাইরে গণ্ডগোল শুনে সবাই বেরিয়ে এল।

জমিদার এসেছে, কোর্টের পেয়াদা এসেছে, নাজির এসেছে, এসেছে শাবল কুড়ুল হাতে এক দঙ্গল মানুষ। আর এসেছে বিরিজামোহন।

নাজির ঘোষণা করল গম্ভীর গলায়: মামলার রায় হতেই এ জমির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, জমি খালি করে দাও।

জমি খালি করে দাও? এ বস্তিটা সুদ্ধ?……হঠাৎ একটা চিৎকার আর হট্টগোল লেগে গেল।

হট্টগোল আর কান্না। ঘর খালি কর……খালি কর।…

আকাশের গুমোট কেটে হাওয়া দিতে শুরু করেছে, অকাল বৈশাখী মেঘ হু হু করে মাথা উঁচিয়ে ধেয়ে আসছে উত্তর পুব কোণ থেকে। গুম্ গুম্ শব্দে ভেসে আসছে রুদ্রের পদধ্বনি।

সারা বস্তিময় কোলাহল, কান্না, ছুটোছুটি জিনিসপত্রের দুম্‌দাম আওয়াজ।……কোথা যাব…কোথা যাব!……

হঠাৎ দেখা গেল শাবল কুড়ুল হাতে দলটা বস্তির একদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাঙতে আরম্ভ করেছে। মাটি আর ছিটে বেড়া, বাঁশ আর কঞ্চি, পুরনো খোলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, ধুলো উড়ছে।

গোবিন্দ স্থির। যেন আচমকা আক্রমণে বুদ্ধিবিভ্রম হয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে বাড়িওয়ালা পড়্ পড়্ করে টেনে ছিঁড়ছে বুকের চুল।

ছুটির ভোঁ বেজে উঠল পোঁ পোঁ করে। কালবৈশাখীর আভা উঠে আসছে মাঝ আকাশে। ঝল্‌সে উঠছে বিদ্যুৎ।

মেয়ে আর শিশু গলার আর্তনাদ ভেসে এল।

আচমকা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যেন গোবিন্দ তীব্র গলায় চিৎকার করে উঠল, না—না, ভাঙতে পারবে না।

বলে সে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শাবল কুড়ুলওয়ালাদের উপর।

রোখ,······থাম।······

জমিদার হুকুম করল, চালাও!······

কিন্তু থেমে গেল ভাঙা, লোকগুলো হঠাৎ পেছু হটতে আরম্ভ করেছে।

বাড়িওয়ালা ছুটে এল, ছুটে এল বস্তির সবাই। একমুহূর্তে যেন নাটকের মঞ্চে বিরতি নেমে এসেছে।

কে একজন চিৎকার করে উঠল, খুন!—

হা হা রবে মেঘ ছুটে আসছে, কালবৈশাখীর অট্টহাসি ভেসে আসছে আকাশ থেকে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

বাড়িওয়ালা চিৎকার করে ডাকল, ফোরটুয়েণ্টি!

নির্বাক গোবিন্দ, সারা গা মাথা রক্তারক্তি। আধবোজা চোখে যেন সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। রোগা শরীর, উস্‌কোখুস্‌কো চুল।

অনেকগুলো গলা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, খুব করেছে।—

জমিদারের দলটা কখন অদৃশ্য হয়েছে এ বিহ্বলতার অবসরে।

বাড়িওয়ালা গোবিন্দকে তুলে নিয়ে এল বস্তির উঠোনে।

বস্তির পূর্ব দিকটা প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সেই মুক্তপথে হু হু করে হাওয়া আসছে। গোবিন্দ তখনো মরেনি। বোধ করি শেষবারের জন্য

সে ওদিকে ফিরে তাকাল।……ওই উ[illegible]ন বিলম্বিত নিউ কর্ড রোড, পূর্বে কোণে ঝাড়ে ছাওয়া বাঁকা রাস্তা চলে গেছে রেল লাইন পেরিয়ে, বহু দূরে—বারাসাত … বসিরহাট…ইটিণ্ডেঘাট, ইছামতী! …ছুতোর বউ, ছেলে……

বায়ুকোণ থেকে শোঁ শোঁ করে হাওয়া ছুটে এল। গোবিন্দের মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। পূর্ব দিকটা বিধ্বস্ত হয়ে যেন বস্তিটা মাঠের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে, যেন আকাশ এসে ছুঁয়েছে উঠোনটা। দুলারী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। গোবিন্দের দোস্তানি। কিন্তু গোবিন্দের চোখের দৃষ্টি তখন স্থির হয়ে গেছে। সে আধখোলা চোখের দৃষ্টি যেন শান্ত, কিন্তু ক্ষুব্ধ।

একজন বলে উঠল, দ্যাখ, শাবল নয়, পেটের কাছে ছুরি মারার দাগ রয়েছে। লুকিয়ে মেরেছে, নইলে…

বাড়িওয়ালা বিড়বিড় করছে, জমিদার… দালাল!

একটা শিশু গলা ফিসফিসিয়ে উঠল, মেরে ফেলেছে ফোর্টুর্শি চাচাকে! খোলা পুব দিক থেকে ঝড়ের ঝাপটা বয়ে যেতে লাগল। সাপের চেরা জিভের মত যেন হিসিয়ে উঠছে বিদ্যুৎ। গুম্ গুম্ শব্দে ধরিত্রী কাঁপছে।

সমস্ত এলাকা খালি করে লোক আসছে, ভরে উঠছে উঠোনটা। সবাই দেখতে আসছে ফোরটুয়েন্টিকে।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, আমি জানি ওকে কে মেরেছে।—কিন্তু মাঝ পথেই অসহ্য তিক্ত গলাটা যেন চেপে বন্ধ হয়ে গেল।

বাড়িওয়ালা ছুটে ঘরে চলে গেল। অসহ্য একটা অপরাধ বোধের যন্ত্রণা তাকে কামড়ে ধরেছে। তার জীবনের শেষ সম্বল তিন শো টাকার থলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে।—কার জন্ত…কার জন্ত এসব! আমি বেইমান! আমি আসল ফকির বনেছি—ফকির।

দুলারী সকলের অলক্ষ্যে নিজের ঘরে গিয়ে মাটিতে মুখ দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল, আমার কলিজার দুটো পাশ; একটা জেলবন্দী আর একটা আমি আপনা হাতে টিপে দিয়েছি, শেষ করেছি।…আমার ভাঙা ঘর…।

সেই রুগ্ন ছেলেটির মধ্যবয়সী মা গোবিন্দের পাশে বসে তার কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল, মুখের রক্ত মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, আমি তোকে যম বলেছি, আমার সোনার বাছা। তোর যম যেন কোনদিন রেহাই না পায়।

আস্তে আস্তে একটা অদ্ভুত গুলতানি উঠতে লাগল ভিড়ের মধ্যে। উঠোনের বাইরে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে ভিড়। গুলতানির শব্দটা যেন দুরন্ত বান আসার আগের গোঙানির মত এক অজানা অন্ধকার থেকে ধেয়ে আসছে।

আকাশের কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা সেই শব্দকে হু হু করে জাড়িয়ে নিয়ে চলেছে দিগন্তে।